বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

দ্বিতীয় বর্ষ■সংখ্যা - ১■জানুয়ারী ২০১২

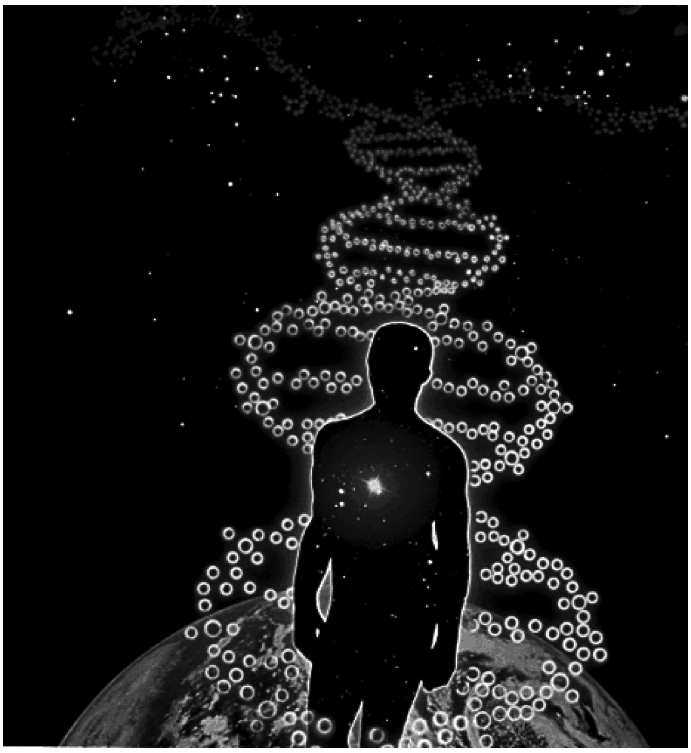

■প্রাণের উৎস সন্ধানে

■মানুষের বিবর্তন কি শুধুই প্রকৃতি নির্ভর ?

■সলিল চৌধুরী ও সঙ্গীতভাবনা

এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত কলাম

দ্বিতীয় বর্ষ❖সংখ্যা - ১❖জানুয়ারী ২০১২

সম্পাদকীয়

ইদানিং বিশ্বের মহাপ্রলয় নিয়ে অনেক হইচই হচ্ছে। বিভিন্ন মহল থেকে এই মহাপ্রলয়ের ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে। কেউ কেউ বিনাশের দিন ক্ষণও নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন। যেমন আমেরিকার এক পাদ্রী হ্যারল্ড ক্যাসপিঙ্গা বাইবেল ঘেঁটে হিসাব নিকাশ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন ২১শে মে ২০১১ মহাপ্রলয়ের তারিখ শুরু হবে। কিন্তু কি কারণে এই মহাপ্রলয় শুরু হবে তা তিনি বর্ণনা করেননি। যা হোক, ঐ তারিখ অতিবাহিত – বিশ্ব কিন্তু নিরাপদেই আছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় মায়া ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২১শে ডিসেম্বর, ২০১২তেই মহাপ্রলয় আসবে এবং তা এতটাই নিশ্চিত যে ঐ ক্যালেন্ডারে ২১শে ডিসেম্বরের পর আর কোন তারিখের উল্লেখ নেই। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মহাপ্রলয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলে, ঈশ্বর নোহাকে বলেছেন মহাপ্রলয় আসছে, তুমি একটি বড়ো নৌকা তৈরী কর এবং তাতে তোমার পরিবারের সাথে সমস্ত প্রজাতির দুটি করে প্রাণী নিয়ে বসে পড়। ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরাণে উল্লেখ আছে মহাপ্রলয় হবেই, তবে তা কবে হবে তা আল্লাহ্ জানেন। সকল হিন্দু পুরাণেই 'কাল' কে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই চারটি কাল যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে ব্রহ্মা তখন নিদ্রায় যাবেন এবং প্রলয় শুরু হবে। আবার যখন ব্রহ্মার নিদ্রাভঙ্গ হবে তখন নতুন করে জগৎ নির্মাণ হবে এবং নতুন যুগের সূচনা হবে। ভবিষ্যৎবক্তা নাস্ট্রেদ্রম্স্ তার গণনায় দেখেছেন একটি বৃহৎ আগুনের গোলা পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে যার সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষে পুরানো সভ্যতা ধ্বংস হবে।

মধ্যযুগে একটি ধূমকেতুর অগ্নিপুচ্ছ পৃথিবীর গতিপথের মধ্যে চলে এলে বিস্তর উল্কাপাতের ঘটনা ঘটে তখনও বহু মানুষ আশঙ্কা করেছিল "পৃথিবীর প্রলয় ঘনিয়ে এসেছে।" ইউরোপ যখন মারাত্মক Bubonic প্লেগে আক্রান্ত হয় তখন গ্রাম-শহর-নগর শ্মশানে পরিণত হয়েছিল তখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ মনে করত 'প্রলয় আগত প্রায়'। আবার যখন যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী, জনজীবনকে আক্রান্ত করেছে তখন সংকটাপন্ন মানুষ বলে উঠেছে 'বিশ্ব-প্রলয় শুরু হয়েছে'। মহাপ্রলয় কিন্তু আসেনি। আজ মানুষ ধূমকেতুকে কোন অতিপ্রাকৃত বস্তু বলে মনে করেনা। ধূমকেতুর গতিবিধি ও উল্কাপাতের বৈজ্ঞানিক কারণ আজ মানুষের জানা। যুদ্ধ, মহামারী, বন্যা, খরা, সুনামীর অর্থ বিশ্বধ্বংস হওয়া নয় বরং এর কারণ জানা থাকলেই তাকে এড়ানো যায়, অনেক ক্ষেত্রে রোধও করা যায়।

শুধু যে নির্বোধ ও অশিক্ষিত মানুষরাই মহাপ্রলয়ের ভবিষ্যৎবাণী করেন তা নয় অনেক বিনাশবাদী বৈজ্ঞানিকও মানবসভ্যতার ধ্বংসের ভবিষ্যৎবাণী অবৈজ্ঞানিকভাবে করে থাকেন। অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন জ্বালানীর অভাবে মানব সভ্যতার ধ্বংস প্রায় আগত। তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে হারে কয়লা ও তেলের ব্যবহার হচ্ছে তা অচিরেই নিঃশেষিত হবে।

বাস্তবিক পৃথিবীতে সঞ্চিত বিপুল জ্বালানীর সামান্য অংশই এখনও পর্যন্ত ব্যবহার হয়েছে। আরও নতুন নতুন কয়লাখনি ও তৈলখনি আবিষ্কৃত হচ্ছে। তবুও একদিন ঐ জ্বালানীতো নিঃশেষ হবে? নিশ্চয়ই হবে। বিজ্ঞান কিন্তু থেমে নেই। সে সৌরশক্তি ও নানা অচিরাচরিত শক্তিকে কাজে লাগাতে শিখেছে।

পদার্থের মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তি নিহিত রয়েছে তার হদিশ বিজ্ঞান পেয়েছে। এই বিভিন্ন প্রকার শক্তির হিসেবী, নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারই আগামী দিনের মানবসভ্যতার জ্বালানী সমস্যার সমাধান করবে।

তাহলে বিজ্ঞানের চোখে মহাপ্রলয় বা ধ্বংস বলতে কি বোঝায়? অন্যান্য তত্ত্বের মতো পৃথিবী তথা মহাবিশ্ব রাতারাতি ধ্বংস হয়ে যাবে এমন ধারণা বিজ্ঞান পোষণ করেনা। মানবজাতি বা অন্যান্য প্রজাতি রাতারাতি ধ্বংস হয়ে যাবে এমন তত্ত্বকেও বিজ্ঞান নাকচ করে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রজাতির আবির্ভাব হয়েছে এই পৃথিবীতে, আবার তারা বিলুপ্তও হয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক নিয়মে। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে, প্রকৃতির সাথে অভিযোজনের ব্যর্থ প্রজাতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি হয় তেমনি নতুন নতুন প্রজাতির আবির্ভাবও ঘটে। বিনাশবাদীদের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তারা কেবল বিনাশটিকেই দেখেন নতুনের সৃষ্টি বা আবির্ভাবটি তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি ও বিকাশের সময়কাল জুড়ে চলে আন্তঃপ্রজাতি ও অন্তঃপ্রজাতি দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই নিহিত আছে আগামীর বার্তা।■

ধারাবাহিক

প্রাণের উৎস সন্ধানে

পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি কিভাবে হল? মানুষের চেতনার উদ্ভবের সাথে সাথে এই প্রশ্নের উদয় হয় প্রতিটি মানুষের মনে। প্রতিটি মানুষ তার নিজের মতো করে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেন। প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি দর্শন, প্রত্যেক দার্শনিক তাদের নিজস্ব মতবাদ সৃষ্টি করেছে। সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে এই প্রশ্নটির উত্তর বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে, তবুও বিভিন্ন সমাজে এই প্রশ্নটি তীব্র দার্শনিক লড়াইয়ের মূল কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে বারে বারে ফিরে এসেছে যা সামাজিক শ্রেণীগুলির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

যুগের পর যুগ ধরে এই বিষয়টি ধর্মীয় পন্ডিতদের মস্তিষ্কপ্রসূত বা কল্পনা প্রসূত ধারণা হিসাবে চর্চিত হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মতো এই বিষয়টিযে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় এই ধারণায় উপনীত হতে মানুষকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। যেহেতু এই প্রশ্নটির সঠিক সমাধান পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ও রসায়নের বিকাশের উপর নির্ভরশীল, তাই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিকাশের সাথে সাথে প্রাণের সৃষ্টি সংক্রান্ত গবেষণা একটি বৈজ্ঞানিক গতি লাভ করে। ফলে পূর্বের বিভিন্ন ভাববাদী মতবাদ প্রথমে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়ায় পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পিছু হঠে, আর বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ঐ সমস্ত ভাববাদী মতবাদ ভুল প্রমাণিত হলেও আজও তা মানুষের মনে টিঁকে রয়েছে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে, পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি সংক্রান্ত যে সমস্ত তত্ত্ব পূর্বে বিরাজ করেছে এবং তা বিবর্তিত হতে হতে কিভাবে বর্তমান তত্ত্বে পৌঁছেছে তা জানা দরকার।

প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির তত্ত্ব (Theory of Spontaneous generation of life) – এই তত্ত্বের মূল কথা হল প্রাণের সৃষ্টি আকস্মিকভাবে হয় এবং পচা গলা বর্জ্য পদার্থ হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা হয়ে থাকে। এই তত্ত্ব সৃষ্টির আদিমতম তত্ত্ব।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক **থালেস** (খ্রীঃ পূঃ ৬০০)-এর ধারনা অনুযায়ী অনিয়াতাকার কাদা (slime) ও তাপের ক্রিয়ায় প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে।

অ্যানাক্সিম্যান্ডার (৬১১-৫৪৭ খ্রীঃ পূঃ) দাবী করতেন সমুদ্রের নীচের বুদবুদের মধ্যে প্রাণের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তার বিকাশ ঘটে। **জেনোফেন** (৫৬০-৪৮০ খ্রীঃ পূঃ) মনে করতেন মাটি ও জলের মধ্য থেকেই জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। **অ্যানাক্সাগোরাস** (৫১০-৪২৮ খ্রীঃ পূঃ)-এর ধারণা অনুযায়ী প্রাণের সৃষ্টি ও বিনাশ সম্ভব নয়। **ডেমোক্রিটাস**-এর মতে জলেই প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (৩৮৪-৩২২ খ্রীঃ পূঃ) তাঁর লিখিত বিভিন্ন রচনায় যেমন 'On the parts of animals' 'On the origin of animals and plants'-তে সেই সময়কার বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাগুলিকে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক প্রশ্নে তাঁর শিক্ষাযে কেবলমাত্র ঐ সমাজে মানব মনে সর্বাধিক প্রভাব ফেলেছিল তা নয় মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির ভিত গড়ে তুলেছিল। তাঁর চিন্তা ভাবনা প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির তত্ত্বের ভিতকে আরও দৃঢ় করেছিল। আর এই তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও একটি তত্ত্ব যার নাম Heterogenesis অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির জীব ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হতে জন্ম নেয়।

অ্যারিস্টটল ধারণা করতেন প্রাণহীন জড় পদার্থ হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণের সৃষ্টি হয়। যেমন ফুলের রেণু থেকেই মৌমাছির সৃষ্টি হয়, অন্যান্য পোকামাকড়ের জন্ম সকালের শিশিরের কণা থেকে, নোংরা খড়ের গাদা থেকে ইঁদুরের সৃষ্টি হয়, জলের নীচের গাছের গুঁড়ি থেকে কুমীর জন্মায় ইত্যাদি ধারণা পোষণ করতেন অ্যারিষ্টটল। অ্যারিষ্টটল ছিলেন গ্রীক বিদ্যায়তনের শিক্ষক তথা সমাজ শিক্ষক। অ্যারিস্টটলের ধারণা তদানিন্তন সমাজে এমনভাবে প্রোথিত ছিল যে মানবমনে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির তত্ত্ব আরও প্রায় দুই হাজার বছর টিঁকে ছিল। এমনকি বর্তমানেও এমন ধারণা অন্য রূপে বহু মানুষের মনে টিঁকে রয়েছে। এই তত্ত্ব প্রথমে গ্রীস, এবং পরবর্তীতে সমস্ত ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। অ্যারিস্টটলের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত

সৃষ্টির তত্ত্ব প্রথমে রোমান পন্ডিত – পরে প্লেটো পরবর্তী দার্শনিক (neoplatonic philosopher) এবং সর্বোপরি খৃষ্টীয় ধর্মযাজক ব্যাসিলিয়াস (৩১৫-৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) এবং সেন্ট অগাষ্টাইন (৩৫৪-৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রহণ করেন।

ব্যাসিলিয়াস প্রচার করেন পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণের সৃষ্টিকর্তা হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের নির্দেশেই পৃথিবীতে তৃণ, তরু ও জীবের সৃষ্টি হয়েছে এই কথা পরবর্তীতে বাইবেলে এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে স্থান পায়।

মধ্যযুগীয় পন্ডিতদের মধ্যেও এমন বিশ্বাস দেখ যেত এবং অনেক প্রখ্যাত পন্ডিত ও পরিব্রাজকরাও দাবী করতেন যে তাঁরা এমন গাছ দেখেছেন তাতে হাঁস, রাজহাঁস এমনকি ভেড়া ফলে রয়েছে। তাই সেই সময় goose tree ও vegetable lamb-এর অনেক গল্প শোনা যেত এবং তা আপামর মানুষ বিশ্বাস করতেন। প্রখ্যাত ইংরেজ বিশ্বকোষ বিশেষজ্ঞ (encyclopedist) আলেকজান্ডার নেকাম (১১৫৭-১২১৭)-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হাঁস ও রাজহাঁস, সামুদ্রিক ঝিনুকের মধ্য থেকে জন্ম নেয় আবার সামুদ্রিক ঝিনুকের জন্ম গাছের ফল থেকেই হয়। এই তত্ত্ব এতটাই সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল যে হাঁস ও রাজহাঁসের মাংস নিরামিষ হিসাবে গ্রহণ করা হত, পরবর্তীতে তৃতীয় পোপ ইনোসেন্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করে সেই রেওয়াজ বন্ধ করেন। Goose tree-র এই তত্ত্ব সপ্তদশ শতাব্দী এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও টিকে ছিল।

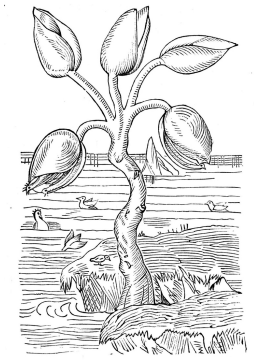

Goose tree

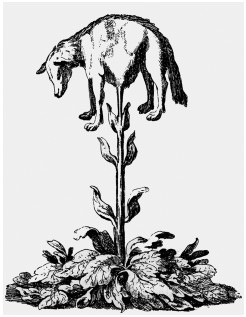

Vegetable lamb

ভ্যান হেলমন্ট (১৫৭৭-১৬৪৪) যিনি গাছের পুষ্টি সংক্রান্ত বহু জটিল সমস্যার সমাধান করেছিলেন তিনিও গমের শাঁস থেকে ইঁদুরের জন্ম হয় মনে করতেন এবং শেষমেষ প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির তত্ত্বকেই সমর্থন করেন। উইলিয়াম হার্ভি (১৫৭৮-১৬৫৭) যিনি মানব শরীরে রক্তসঞ্চালন আবিষ্কার করে জীববিজ্ঞানের আলোড়ন তুলেছিলেন এবং যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন মোড় এনে দিয়েছিল – তিনিও এই তত্ত্বের বিরোধীতা করেন নি। 'All living from the egg'-অর্থাৎ সমস্ত জীবই ডিম বা ডিম্বানু হতেই সৃষ্টি হয় – এই তত্ত্বের প্রবক্তাও ছিলেন এই হার্ভি। আইজাক নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭) যদিও জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমস্যা নিয়ে খুব বেশী মনোযোগ দেননি তবুও তিনি প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির সম্ভাবনা স্বীকার করতেন। নিউটন বিশ্বাস করতেন ধূমকেতুর লেজ হতে পৃথিবীতে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়েছে যদিও তার কোন প্রমাণ নিউটন দেননি।

পদার্থবিদ ফ্রান্সিসকো রেডি (১৬২৬-১৬৯৭)-র বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তার ফলাফল সর্বপ্রথম প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির তত্ত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। বলা যেতে পারে রেডি-র পূর্ববর্তী প্রবক্তারা কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতীত কেবল মাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন বা কোন ঘটনার বেঠিক পর্যবেক্ষণ এবং তার থেকে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় – মাংস বা মাছের টুকরো কয়েকদিন রেখে দিলে তা থেকে এক প্রকার সাদা পোকার জন্ম হয় – এই পর্যবেক্ষণ থেকে যদি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে পচা মাছ-মাংস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণের সৃষ্টি হয়, তবে তা নির্ভুল হবে না। ফ্রান্সিসকো রেডি দুটি পৃথক পাত্রে টাটকা মাংসের টুকরো নেন এবং একটি পাত্রকে স্বচ্ছ মসলিন কাপড়ে ঢেকে দেন ও অন্যটিকে রাখেন অনাবৃত অবস্থায়। এবার তিনি লক্ষ্য করেন অনাবৃত পাত্রের মাংসে মাছি এসে বসছে, ডিম পাড়ছে এবং ডিম ক্রমে ক্রমে মাছির লার্ভায় পরিবর্তিত হচ্ছে যা সাদা পোকার মতো দেখাচ্ছে ও মাংসের পচন শুরু হচ্ছে। রেডির এই পরীক্ষা একদিকে বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু অন্যদিকে রেডি বেশ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। যেমন, মাংসের বা মাছের টুকরোতে মাছি না বসলেও তার পচন হয় – তা কিভাবে সম্ভব? বাস্তবিক এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের জানা ছিল না।

ডাচ বৈজ্ঞানিক অ্যান্টন ভ্যান লিউয়েন হক (১৬৩২-১৭২৩) একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন যার নাম অনুবীক্ষণ যন্ত্র (microscope)। যাতে চোখ রেখে লিউয়েনহক ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র প্রাণের এক অন্য দুনিয়া আবিষ্কার করেন। যা খালি চোখে দেখা অসম্ভব। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি লক্ষ্য করেন বিভিন্ন পচনশীল খাদ্যবস্তু, গেঁজে ওঠা (fermented) জৈব পদার্থ, টকে যাওয়া দুধ (Sour milk) ইত্যাদিতে জীবাণুর পরিমাণ অনেক বেশী। লন্ডনের রয়েল সোসাইটিকে লেখা বহু চিঠিতে তিনি বর্ণনা করেন পরীক্ষার মাধ্যমে কিভাবে মাংসের ক্বাথ (bouillon) বা সবজির ক্বাথ (vegetable infusion) কোনো পাত্রে রেখে তাপ দিলেই তার থেকে ধীরে ধীরে জীবাণুর আবির্ভাব তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার জীবাণু যেমন ব্যাকটিরিয়া, ঈষ্ট, মোল্ড ইত্যাদির শ্রেণী বিভাগ করেন এবং তাদের গঠনাকৃতি ছবি এঁকে

দেখান। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মনে পোষণ করা প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির তত্ত্ব অন্য মোড় নিল। অর্থাৎ বহু বৈজ্ঞানিক মনে করতে শুরু করলেন নির্জীব জড় পদার্থ থেকে মানুষের অগোচরে জীবাণুর সৃষ্টি হয়, যে জীবাণুর অস্তিত্ব অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃশ্যমান হয়। সেই সময় বিজ্ঞানী লুই জবলট, লিউয়েনহকের এক অনুগামী একটি পরীক্ষায় দেখেন যে একটি তৃণ-ক্বাথ (hay infusioin)-এর নমুনাকে ১৫ মিনিট ফুটিয়ে একটি পাত্রে রেখে পার্চমেন্ট কাগজে মুড়ে বায়ুনিরোধক অবস্থায় ঠান্ডা করার দীর্ঘক্ষণ পরেও ঐ নমুনায় কোন জীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। কিন্তু ঐ নমুনা অনাবৃত করার সাথে সাথে জীবাণুর আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী জীববিজ্ঞানী বুফোঁ (১৭০৭-১৭৮৮) বলেন জৈব পদার্থের বিয়োজনের ফলে জৈব পদার্থের সরলীকরণ ঘটে কিন্তু তার জৈবিক ধর্ম নষ্ট হয় না বরং তা পুনর্মিলিত হয়ে জীবাণুর মতো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র প্রাণের সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন জৈব পদার্থের মধ্যে জীবনীশক্তির (vital force) কখনই নষ্ট হয় না এবং তা প্রাণ সৃষ্টির পূর্ব শর্ত হিসাবে বিরাজ করে। কিন্তু এই জৈব পদার্থের উপাদান কি বা জীবনীশক্তির স্বরূপটাই বা কি সে বিষয়ে আলোকপাত করতে তিনি অক্ষম হন।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় বিজ্ঞানী ল্যাজারো স্প্যালাঞ্জানী (Lazzaro Spallanzani) বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বাতাসে জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে এবং তরল পদার্থকে দীর্ঘক্ষণ ফোটালে জীবাণুর অস্তিত্ব লোপ পায় তা পরীক্ষা করে দেখান। কিন্তু সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক যেমন স্কটিশ বিজ্ঞানী নীডহ্যাম (১৭১৩-১৭৮১), গে লুসাক (১৭৭৮-১৮৫০) জার্মান বৈজ্ঞানিক টি সোয়ান (১৮৩৬), বিজ্ঞানী সুল্‌জ, বিজ্ঞানী পাউচেট (১৮৫৯) প্রমুখ তাঁদের পৃথক পৃথক পরীক্ষায় পৃথক পৃথক ফল পান যা ছিল পরস্পর বিরোধী। এই পরস্পর বিরোধী ফলাফল হতে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ফলে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির তত্ত্বের সঠিকতা বা বেঠিকতা নিয়ে কোন নির্দিষ্ট সমাধান তো হলই না বরং বিষয়টি আরও রহস্যময় রূপ নিল। বিজ্ঞানের গবেষণায় এমন পরিস্থিতি বহুবার এসেছে যখন পুরনো তত্ত্বকে পুরোপুরি ভুল প্রমাণ করা যায়নি বলে পুরোপুরি বর্জন করা যায়নি অন্য দিকে নতুন তত্ত্বকে পুরোপুরি সঠিক প্রমাণ করা যায়নি বলে পুরোপুরি গ্রহণ করাও যায় নি। এই পুরানো ও নতুনের দ্বন্দ্ব খুবই স্বাভাবিক কারণ এই দ্বন্দ্ব থেকেই পুরানোর হার ও নতুনের জয় হয়, বিজ্ঞান তথা মানবসমাজ বিকশিত হয়। এই পরিস্থিতিতে গবেষকদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বর্জন করে মৌলিক চিন্তা দিয়ে বস্তুগত বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করা একান্ত ভাবে জরুরী হয়ে পড়ে।

প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ঠিক এই কাজটি নিপুণভাবে করলেন। অতীতের ও তাঁর সমসাময়িক গবেষকদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে অন্ধের মতো অনুসরণ না করে, মূল সমস্যাটিকে বস্তুবাদী দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে দেখার চেষ্টা করলেন। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যেখানে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির তত্ত্বকে সমর্থনের লক্ষ্যে কিংবা বাতিলের লক্ষ্যে গবেষণা করেছিলেন, সেখানে লুই পাস্তুর তাঁর পূর্বতন গবেষকদের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের তোয়াক্কা না করে তাঁদের পদ্ধতিগত ভুলভ্রান্তিগুলিকে দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। লুই পাস্তুর প্রথমেই নিজে দেখলেন এবং সকলকে দেখালেন একটা অদৃশ্য জগৎ – জীবাণুর জগৎ। তার উপস্থিতি সর্বস্থলে – জলে, বায়ুতে, খাদ্যবস্তুতে এমনকি গবেষণাগারে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাতেও। যতক্ষণ না পর্যন্ত খাদ্যবস্তুতে এর উপস্থিতি সম্পূর্ণভাবে রোধ করা যাচ্ছে ততক্ষণ প্রমাণ করা যাবে না খাদ্যবস্তুতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবাণুর সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। তিনি দেখলেন আগের গবেষকরা যে সমস্ত পদ্ধতিতে

লুই পাস্তুর

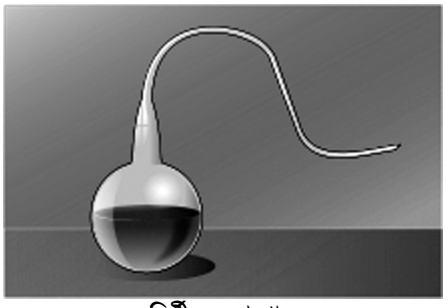

নির্বীজকরণ পাত্র

খাদ্যবস্তুকে জীবাণুমুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন বা জীবাণুমুক্ত হয়েছে বলে দাবী করেছিলেন তা আসলে ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তাই তারা পাচ্ছিলেন পরস্পর বিরোধী ফল। আর এই কারণেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল। লুই পাস্তুর বুঝলেন এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার যাতে খাদ্যবস্তুতে দীর্ঘক্ষণ জীবাণু মুক্ত রাখা যাবে। অচিরেই আবিস্কৃত হল সেই পদ্ধতি যার নাম **নির্বীজকরণ** (sterilisation), যার মাধ্যমে শুধু খাদ্য বস্তুকেই নয় যে কোন বস্তুকে একশ শতাংশ নির্বীজকরণ করা সম্ভবপর হ'ল। একবার দু'বার নয়, বারবার। আর প্রতিবারই লুই পাস্তুর দেখালেন ঐ পদ্ধতিতে নির্বীজকরণ করা খাদ্যবস্তুতে কোন অবস্থাতেই জীবাণু

জন্মাচ্ছে না। খাদ্যবস্তু পরিবর্তন ক'রে বা পরীক্ষার স্থান পরিবর্তন ক'রেও প্রতিবারই একই ফলাফল পাওয়া গেল। একেই বলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

লুই পাস্তুরের এই পরীক্ষা প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির তত্ত্বকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিক সত্যতাকে শুধু অস্বীকারই করে নি বরং এই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিষেধাজ্ঞা জারী করে ছিল। কারণ এই বিষয়ে গবেষণাগত ফলাফলগুলি, গীর্জার মূল ভিত্তিকেই অগ্রাহ্য করে।

একদিকে প্রাণে উৎস সন্ধানে বিজ্ঞান নতুন মোড় নিল অন্য দিকে চলল গীর্জার গোয়েন্দাগিরি।

প্রাণের ধারাবাহিকতার তত্ত্ব (Theory of continuity of life) – এই তত্ত্ব'ও প্রাণের সৃষ্টির বিষয়ে কোনও বৈজ্ঞানিক আলোকপাত করল না। এই তত্ত্বে বলা হল প্রাণের সৃষ্টি কোনও বিশেষ পদ্ধতি ও শক্তির দ্বারাই হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন জৈব পদার্থের জটিল সংমিশ্রণেই প্রাণের সৃষ্টি সম্ভব কারণ জৈব পদার্থের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এক বিশেষ জীবনী শক্তি বা ভাইটাল ফোর্স, অর্থাৎ প্রাণ হল শাশ্বত, অব্যয়। একই তত্ত্বে বলা হয় জৈবপদার্থই আসলে শাশ্বত। জৈব পদার্থের মধ্যে রয়েছে ভাইটাল ফোর্স তাই তা কোনও পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে তৈরী করা সম্ভব নয়। জন্ম হল **ভাইটাল ফোর্স থিওরি বা থিওরি অফ ভাইটালিজম**-এর।

দার্শনিক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বললেন, অ্যারিস্টটলের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের তত্ত্ব, সেন্ট অগাষ্টাইনের ঐশ্বরীয় ইচ্ছায় প্রাণের সৃষ্টির তত্ত্ব, আর ভাইটাল ফোর্স থিওরি আসলে একই তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ। "জৈব পদার্থ বা কার্বন যৌগগুলি শাশ্বত" – এই বুলির উত্তরে তিনি বলেন কোন জৈব পদার্থই নিত্য বা শাশ্বত নয় কারণ জীবদেহে জৈব পদার্থের যেমন সৃষ্টি আছে তেমনি লয়ও আছে। উদারহরণ স্বরূপ, প্রোটিন অণুগুলি প্রাণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রোটিন অণুগুলি জীবদেহে যেমন অতি জটিল প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় তেমনি জটিল অণুগুলি ভেঙ্গে গিয়ে অনেক সরল অণু তৈরী হয়। যুক্তির খাতিরেও কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) বা মিথেন (CH_4) -এর মত সরলতম যৌগকেও শাশ্বত বলা যেতে পারে না, কারণ যদিও আদিম পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব ছিল, ঐ দুই যৌগ তাদের মৌল থেকে যেমন অবিরত তৈরী হচ্ছে, তেমনি অন্য পদার্থে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

তাহলে প্রশ্ন হল পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হল কিভাবে? পৃথিবীও শাশ্বত নয়। কারণ তারও সৃষ্টি আছে। আর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে সৃষ্টির সময় তা ছিল একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড। ঐ অতি উচ্চ তাপমাত্রায় সরলতম এককোষী প্রাণীর অস্তিত্বও সম্ভব ছিল না। তাহলে বৈজ্ঞানিকদের হাতে রইল দুটি সম্ভাবনা ১) প্রাণের সৃষ্টি পৃথিবী শীতল হবার প্রক্রিয়ায় কোন সময়ে এই পৃথিবীতেই হয়েছে বা ২) প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে বহির্বিশ্বে এবং তা কোন সময়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে (Theory of cosmozoa)।

কসমোজোয়া তত্ত্বের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক রিখটার ও লিবীগ বললেন, সমস্যা এটা নয় যে কিভাবে প্রাণের সৃষ্টি হল, সমস্যা হল কিভাবে বহির্বিশ্বে সৃষ্ট প্রাণ পৃথিবীর পরিমন্ডলে প্রবেশ করল। জীবাণু স্পোর (Spore) সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণের সমস্ত শর্তগুলি বজায় রাখতে পারে এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রার মধ্যে তা দীর্ঘদিন টিঁকে থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন অনুকূল পরিবেশ পায় ততক্ষণ স্পোর জড় ও জীবের মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে যায়। লিবীগ-এর মতে পৃথিবী শীতল হবার পর কোনও ভাবে এই জীবাণুর স্পোর পৃথিবীতে পৌছায় আর পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ প্রাণের সৃষ্টি বহির্জগতেই হয়েছে। এই তত্ত্বের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক ভন্ হেলমোজ বলেন, উল্কাপিন্ডের সাথে বহির্জগত থেকে জীবাণু পৃথিবীতে এসেছে। সুইডিশ রসায়নবিদ আরহেনিয়াস্ এই তত্ত্ব শুধু সমর্থনই করেন নি, হিসাব নিকাশের মাধ্যমে তিনি দেখালেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা কিভাবে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে, এমনকি এক সৌরজগত হতে অন্য সৌরজগতে যেতে পারে। তিনি জীবাণুর স্পোর-কে একটি কনিকা ধরে নিয়ে হিসাব করে দেখালেন এই সৌরজগতের প্রতিবেশী সৌরজগতের নক্ষত্রে যেতে একটি স্পোর-এর ৯০০০ বছর সময় লাগবে। আর যেহেতু স্পোরগুলি প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে তাই এই দীর্ঘপথ অতিক্রম কালে স্পোরের মধ্যে নিহিত প্রাণের শর্তগুলিও অবিকৃত থাকবে। এমন ধারণাই পোষণ করতেন আরহেনিয়াস এবং সমসাময়িক কিছু বৈজ্ঞানিক।

কিন্তু সমসাময়িক কালে নক্ষত্র থেকে নির্গত স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিকিরণের মারণ ক্রিয়া-র আবিষ্কারের পর কসমোজোয়া তত্ত্বের কার্যতঃ বিলোপ ঘটে। সূর্য থেকে বিকিরিত বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রশ্মির পরীক্ষায় দেখা গেছে স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রশ্মি যেমন, অতিবেগুনী রশ্মি (UV ray) মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray) ইত্যাদি হ'ল উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট তরঙ্গ যার প্রবল মারণ ক্রিয়ায় জীবাণু তো বটেই, স্পোরও ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে অতিবেগুনী রশ্মি কৃত্রিমভাবে তৈরী করা যায় এবং ঐ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে পাণীয় জলকে একশ শতাংশ জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ বহির্বিশ্ব হতে আণুবীক্ষণিক কোনও জীবাণু পৃথিবীর আবহাওয়ায় প্রবেশ করার আগেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই কসমোজোয়া তত্ত্বকে খারিজ করে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল পৃথিবীর পরিমন্ডলের মধ্যে কিভাবে প্রাণের সৃষ্টি হল তার উৎস সন্ধান করা। (চলবে)

মানুষের বিবর্তন কি শুধুই প্রকৃতি নির্ভর ?

"কোথা থেকে এলাম আমি!" – ছোট্ট শিশুর এই প্রশ্ন যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক ও সম্পর্কিত প্রশ্ন হল পৃথিবীতে মানুষ এল কোথা থেকে?

এ প্রসঙ্গে নানা মতবাদ থাকলেও, জীববিদ চার্লস ডারউইন সর্বপ্রথম এর বিজ্ঞান সম্মত মতবাদটি প্রদান করেন। ডারউইনের মতে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জীবের অভিব্যক্তি ঘটেছে আর এই অভিব্যক্তির পথেই মানুষের আর্বির্ভাব। ডারউইনের জীবদ্দশায়,"ডারউইনবাদ" গীর্জার ঘন্টায় সমাধিস্থ হয়েছিল। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে তা সমাধি ভেদ করে উঠে আসে। ডারউইনবাদের ১৫০ বছর পূর্তির সময়, পোপ – "ডারউইনবাদের" জীবন্ত সমাধির কথা উল্লেখ করে ভুল স্বীকার করে নেন।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের পর্যায়গুলি হল –

ক) জীবন সংগ্রাম – অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম, আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম

খ) যোগ্যতমের উদবর্তন

গ) বিভেদ বা প্রকরণ

ঘ) প্রাকৃতিক নির্বাচন

জৈব অভিব্যক্তি কি এবং কিভাবে ঘটে

জৈব অভিব্যক্তির মূলকথা হল আদিম, অনুন্নত সরল জীব থেকে অতি ধীরে কালক্রমে আধুনিক উন্নতমানের জটিল গঠনতন্ত্র যুক্ত জীবের আবির্ভাব ঘটা। অভিব্যক্তি সম্পর্কিত প্রমাণগুলি হল –

১) অঙ্গ সংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ

২) নিষ্ক্রিয় অঙ্গ সম্পর্কিত প্রমাণ

৩) জীবাশ্ম সম্পর্কিত প্রমাণ

৪) ভ্রূণ সম্পর্কিত প্রমাণ

৫) ভৌগোলিক প্রমাণ

৬) প্রাণ রসায়ন সম্পর্কিত প্রমাণ

পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হতে হতে জীব নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে – যা জীবকে পরিবেশের উপযুক্ত করে তোলে। একই পরিবেশে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর একই রকম অভিযোজন ঘটে, যাকে অভিসারী অভিযোজন (Convergent Adaptation) বলা হয়। এর ফলেই বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সমবৃত্তি অঙ্গ (analogus organ) পরিলক্ষিত হয়। যেমন ফড়িং-এর পাখনা, পাখির ডানা, বাদুরের ডানা। এই অঙ্গগুলির অভ্যন্তরীণ গঠনগত মিল না থাকলেও কার্যগত মিল আছে। আবার একই গণ বা নিকটবর্তী গণের প্রাণীরা বিভিন্ন পরিবেশে থাকার ফলে ভিন্ন ভিন্নভাবে অভিযোজিত হয় – অপসারি অভিযোজন (Divergent Adaptation) বলা হয়। যার কারণে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সমসংস্থ অঙ্গের (homologus organ) আবির্ভাব ঘটে। যেমন তিমির ফ্লিপার, ঘোড়ার অগ্রপদ, মানুষের হাত। এই অঙ্গগুলির অভ্যন্তরীণ গঠনগত মিল থাকলেও কার্যগত মিল থাকে না। অপসারি অভিযোজনের ফলে অনেক সময় নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে। ডারউইনের মতে জীবন সংগ্রাম ও প্রকরণের ফলেই অপত্য জনুতে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ভাইসম্যান ও তার অনুগামীদের মতে বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয়ে জীবের অভিযোজন সম্ভবপর হয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ এই ঘটনাগুলির মধ্যে একটি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জৈব অভিব্যক্তি কোনও সরল রৈখিক পথে ঘটে নি। আবার শুধুমাত্র সর্পিল পথেই একই হারে ঘটেছে এমন নয়। বিবর্তনের হার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এবং কখনোই তা সুষম ছিল না। কিন্তু বিবর্তন কখনই পশ্চাৎ অভিমুখী হয়নি। বিবর্তনের বিভিন্ন পথ বিভিন্ন সময়ে থমকে গেছে, কিন্তু প্রত্যাবর্তন করে নি। তাই বিবর্তন একটি প্রগতিশীল প্রক্রিয়া। বিবর্তনের হার যেমন সুষম নয়, তেমনি

প্রজাতি সৃষ্টির সংখ্যাও সুষম নয়। যে কোন সময় অবকাশে জীবজগতে প্রজাতির সংখ্যা একটি গতিশীল সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে। এই গতিশীল সাম্য বজায় থাকে একদিকে নতুন উন্নত মানের আধিপত্যকারী প্রজাতি সৃষ্টির ধনাত্মক সংযোজন, অন্যদিকে পুরাতন অনুন্নত প্রজাতির ঋণাত্মক বিলোপের মাধ্যমে। যেহেতু প্রজাতি সংযোজনের হার এবং প্রজাতি বিলোপের হার সমাধান হয় না, তাই পৃথিবীতে প্রজাতির সংখ্যাও ধ্রুবক নয়। প্রজাতির সৃষ্টি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে বংশগতি, জনন, মিউটেশন এবং জেনেটিক্যাল ড্রিফটের মাধ্যমে ঘটে। প্রজাতি বা গণের পরিবর্তন এবং নতুন প্রজাতি বা গণের সৃষ্টির প্রক্রিয়া দীর্ঘকালীন হলেও এর বহিঃপ্রকাশ হঠাৎ ও দ্রুত ঘটে। এর ফলে পূর্বের প্রজাতি বা গণের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। আঞ্চলিক প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন যেমন আঞ্চলিক জীবজগতে পরিবর্তন এনেছে, তেমনি পৃথিবী জোড়া পরিবেশের পরিবর্তন, ভৌগলিকভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জীবজগতে পরিবর্তন এনেছে। প্রজাতির বিলোপ অভিযোজনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক প্রজাতির বা গণ থেকে অন্য প্রজাতি বা গণের রূপান্তরের মধ্যবর্তী পর্যায়ের জীবেরা স্বাভাবিকভাবেই অবলুপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতিগুলির মধ্যকার মিসিং লিংক এই অভিব্যক্তির পক্ষে জোরালো প্রমাণ। যেমন

ক) ইচথাইয়েস্টেগা → মাছ ও উভচরের মধ্যকার মিসিং লিংক

খ) সেমুরিয়া → উভচর ও সরীসৃপের মধ্যকার মিসিং লিংক

গ) আর্কিঅপ্টেরিক্স → সরীসৃপ ও পাখীর মধ্যকার মিসিং লিংক

ঘ) প্লাটিপাস → সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যকার মিসিং লিংক

বা **গণ বিলোপ** বলা হয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে বার বার এমন ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ৬০ মিলিয়ন বছর আগে মেসোজোয়িক যুগের শেষ পর্যায় এরূপ মাস এক্সটিংকশন ঘটেছিল। এর ফলে ডাইনোসর সহ নানা সরীসৃপ, অ্যামোনয়েড প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়। সাধারণভাবে প্রতিটি গ্লোবাল কুলিং এর সময়ই মাস এক্সটিংকশন ঘটেছে। (চিত্র ঃ ১)

অভিব্যক্তির পথে মিউটেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। জিন তথা ডিএনএ অনুর রাসায়নিক পরিবর্তন এবং এর ফলাফলকে মিউটেশন বলা হয়। মিউটেশন দুই ধরণের হয়, যথা জিন মিউটেশন ও ক্রোমোজোম মিউটেশন। ধারণা করা

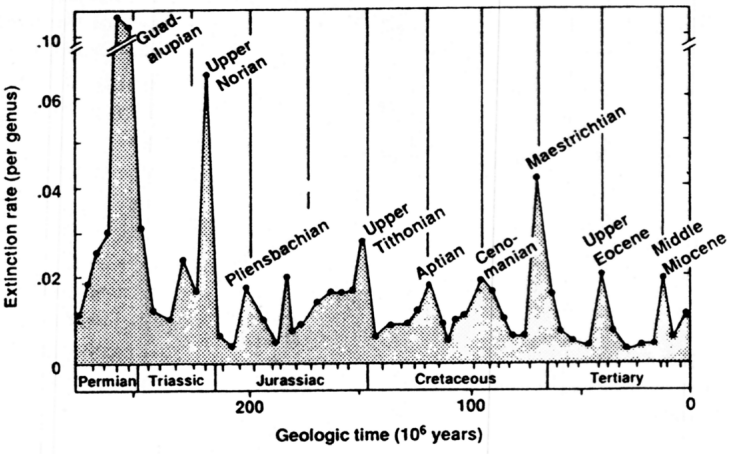

চিত্র ১ ঃ ভূ-তাত্ত্বিক সময় অনুসারে বিভিন্ন প্রজাতির গণবিলোপ

এই মিসিং লিংকগুলির জীবাশ্ম ও ভূ-তাত্ত্বিক সময় স্কেলে তাদের বয়স অনুযায়ী শৃঙ্খলিত করলে বোঝা যায় যে,

অভিব্যক্তির পথে যেমন এক group এর প্রাণী থেকে অন্য group এর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে, তেমনি আবার একই প্রাণীর পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনও ঘটেছে। যেমন ঘোড়া, হাতি, উট ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

অভিব্যক্তির পথে, প্রজাতির সংখ্যার গতিশীল সাম্যবস্থায় পরিবেশে শক্তিচক্রের ভারসাম্য দারুনভাবে বিঘ্নিত হলে, এক সঙ্গে প্রচুর প্রজাতির বিলোপ ঘটে, যাকে **মাস এক্সটিংকশন**

মাছ (৫৩ কোটি বছর আগে) → উভচর (৩৭ কোটি বছর আগে) → সরিসৃপ (৩০ কোটি বছর আগে) → পাখি (১৯.৫ কোটি বছর আগে)
সরিসৃপ → স্তন্যপায়ী (২১.৫ কোটি বছর আগে)

হয়, যে প্রতি ১২০০০ জনন কোষে একটি জিনের পরিবর্তন ঘটে। সাধারণত প্রাণীর জিনের পরিব্যক্তি ক্ষয়সূচক হয়। কারণ পরিব্যক্তি হঠাৎ ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটে। পরিব্যক্ত জিনগুলি হেটারোজাইগোট হিসাবে প্রাণীগোষ্ঠীতে বিরাজ করে, হোমোজাইগাস অবস্থায় প্রকাশ পায় এবং এই প্রকাশ যদি প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা অপসারিত হয়। প্রকৃতিতে দেখা গেছে হেটারোজাইগোটরা জীবন সংগ্রামে হোমোজাইগোটদের তুলনায় অনেক বেশী সফল। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতি হেটারোজাইগোটদের অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচনা করে ও নির্বাচিত করে। পরিব্যক্তির প্রকাশ যেহেতু হঠাৎ করে ঘটে, তাই বৈজ্ঞানিক হিউ গো ডিভ্রাইস অভিব্যক্তিকে একটি বিচ্ছিন্ন পদ্ধতি বলে বিবেচনা করেন যা ডারউইনের অভিব্যক্তি সম্পর্কিত ধারাবাহিক পদ্ধতির পরিপন্থী। পরবর্তীকালে, বিজ্ঞানী ডবঝিনস্কি'র মতে, বৃহৎমাত্রায় পরিব্যক্তি প্রজাতির অভিযোজিত বৈশিষ্টের স্থায়িত্বের পরিপন্থী হয়, যার ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচন অর্জন না করে লুপ্ত হয়, অভিব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিব্যক্তির ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার পুঞ্জিভূত ফল। সুতরাং বিবর্তন ধীরে ও অবিচ্ছিন্ন গতিতেই ঘটে চলে। পরিব্যক্তির ফলেই অপত্য জনুর সন্তানদের মধ্যে প্রকরণ লক্ষ্য করা যায়। আবার মায়োসিস্ প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের সময় ক্রসিং ওভারের ফলে প্রকরণের সৃষ্টি হয়। যে কোন প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন পপুলেশনের বেশী সংখ্যক প্রাণী স্বাভাবিক জিন বহন করে এবং কম সংখ্যক প্রাণীতে পরিব্যক্ত জিন থাকে।

পরিবেশের পরিবর্তন হল, বাহ্যিক শর্তের পরিবর্তন। আর এই ধীর ও ধারাবাহিক বাহ্যিক শর্তের পরিবর্তনের ফলে, জীব এর অভ্যন্তরীণ শর্তের পরিবর্তন হল মিউটেশন। আবার মিউটেশনের সম্মিলিত ফল হল অভিব্যক্তি – যা নতুন প্রজাতি বা গণ বা বর্গের সৃষ্টি করে। অভিব্যক্তির ফলে যে নতুন প্রজাতি বা গণ প্রাকৃতিক নির্বাচনে জয়ী হয়, তার অস্তিত্ব জনন এবং বংশগতির মাধ্যমে রক্ষিত হয়। যে কোনও প্রজাতি বা গণ বা বর্গের আবির্ভাব ঘটেছে আগে। তারপর জনন প্রক্রিয়ায় তার অপত্য উৎপন্ন হয়েছে প্রত্যক্ষ পরিস্ফুটন বা পরোক্ষ পরিস্ফুটন পদ্ধতিতে। তাই, "ডিম আগে, না মুরগী আগে" প্রশ্নটাই অবান্তর।

হিউগো ডি-ভ্রাইসের মিউটেশনবাদ, ভ্যাইসম্যান-এর জার্মপ্লাজম্ তত্ত্ব, মেন্ডেলের বংশিগতি সূত্র, ডবঝিনস্কির জেনেটিকাল অভিব্যক্তিবাদ, আনবিক জীববিদ্যা (মলিকিউলার বায়োলজি) ও প্রাণ রসায়ন (বায়ো কেমিস্ট্রি) এর উন্নতির ফলে ডারউইন ও ল্যামার্কের অভিব্যক্তির সূত্র, বিবর্তনের সংশ্লেষ তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। বিবর্তনের সংশ্লেষ তত্ত্ব

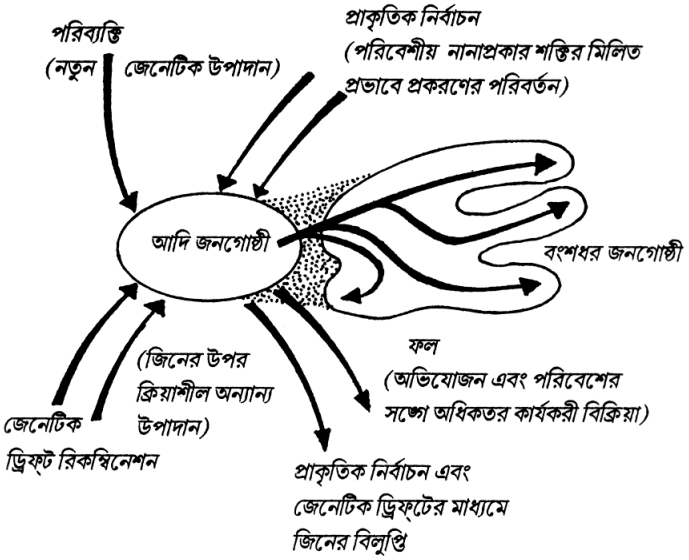

চিত্র ঃ ২ পরিব্যক্তি, প্রাকৃতিক নির্বাচন, জেনেটিক ড্রিফ্ট এবং রিকম্বিনেশনের ফলে আদি জনগোষ্ঠী থেকে উৎপন্ন বংশধর জনগোষ্ঠীর সফল অভিযোজন।

বৈজ্ঞানিক স্যাভেজ-এর রূপরেখা অনুসারে পরিব্যক্তি (মিউটেশন), প্রাকৃতিক নির্বাচন (ন্যাচারাল সিলেকশন), রি কমবিনেশন এবং জেনেটিক্যাল ড্রিফ্ট-এর সমন্বয়ের মাধ্যমে আদি জনগোষ্ঠী পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত জনগোষ্ঠী পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে বংশগতিতে সঞ্চারিত হয়। (চিত্র ঃ ২)

মানুষের বিবর্তন

প্রাণী জগতে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে [বিবর্তনের মাধ্যমে] অপসারি অভিযোজনের ফলেই বিবর্তনের পথে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এ বিষয়ে গবেষণা ও আবিষ্কারগুলি যেমন

মানুষের বিবর্তনের দুটি প্রস্তাবিত ধারা

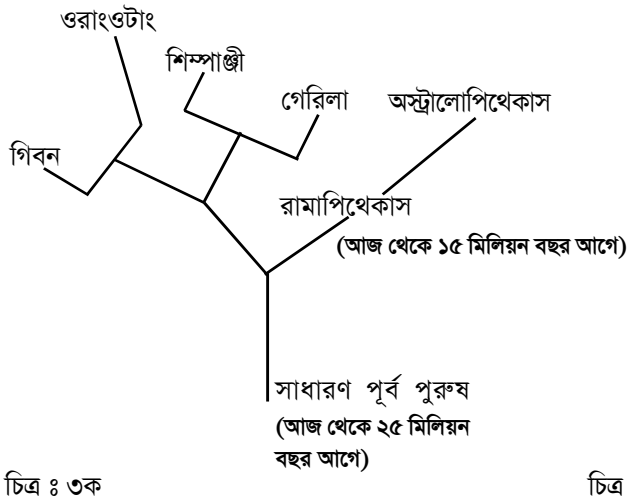

চিত্র ঃ ৩ক

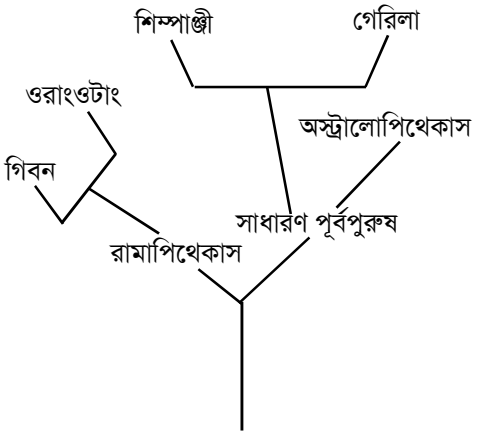

চিত্র ঃ ৩খ

যেমন ঘটেছে, তার উপর নির্ভর করে তেমন তেমন ধারণা বিকাশ ঘটেছে।

প্রাণী রাজ্যে মানুষের বিবর্তন বর্গ (order) থেকে শ্রেণীতে (class), শ্রেণী (class) থেকে গণে (genus) এবং গণ থেকে প্রজাতিতে (spicies) যেমন ঘটেছে, তেমনি আবার প্রজাতির মধ্যে বিবর্তন ঘটেছে। মানুষের পূর্বপুরুষ হোমোগণের প্রথম প্রজাতি হ্যাবিলিস। এই প্রজাতির বিবর্তনের ধারাটি নিম্নরূপ – চিত্র ঃ ৩

এখন দেখা যাচ্ছে, মানুষের বিবর্তনে হোমো হ্যাবিলিস থেকে বর্তমানের হোমো সেপিয়ান সেপিয়ান পর্যন্ত বিবর্তনের

হোমো সেপিয়ান ফিউচারিস — **ভবিষ্যতে**
↑
হোমো সেপিয়ান সেপিয়ান — **২৫০০০ বছর আগে**
↑
হোমো সেপিয়ান — **১.০-১.৫ মিলিয়ন বছর আগে**
↑
হোমো ইরেক্টাস — **১.৭ মিলিয়ন বছর আগে**
↑
হোমো হ্যাবিলিস — **৩.৫ মিলিয়ন বছর আগে**
↑
অস্ট্রালোপিথেকাস — **৫ মিলিয়ন বছর আগে**

হার সমসাময়িক প্রাণীদের অপেক্ষা বেশী এবং মাস এক্সটিংকশন-এ মানুষ লুপ্ত হয়ে যায় নি, যেখানে প্রাকৃতিকভাবে মানুষ অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী (যেমন লম্বা দাঁতওয়ালা সাইবেরিয়ান বাঘ, বিশালাকার হাতি উলি ম্যামোথ) প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এর কারণ কি?

মানব জীবন থেকে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ ধারাবাহিকভাবে খর্ব হয়েছে ঐক্যবদ্ধ মানুষের সামাজিক শ্রম ও হাতিয়ার ব্যবহারের কারণে। তাই প্রাকৃতিকভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ দ্বারা মানুষের বিবর্তন সম্পূর্ণ রূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের বিবর্তনে ধারাবাহিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হলো –

১) ভাষার আবিষ্কার
২) হাতিয়ারের ব্যবহার
৩) আগুনের ব্যবহার
৪) পশুপালন
৫) কৃষির আবিষ্কার
৬) ঘরবাড়ি ও পোশাকের ব্যবহার

১) ভাষার আবিষ্কার

ভাষার আবিষ্কার মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়। ভাষার সাহায্যে মানুষে মানুষে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। ভাষার সাহায্যেই মানুষ চিন্তা করতে পারে। অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞান ভাষার মাধ্যমেই এক প্রজন্ম

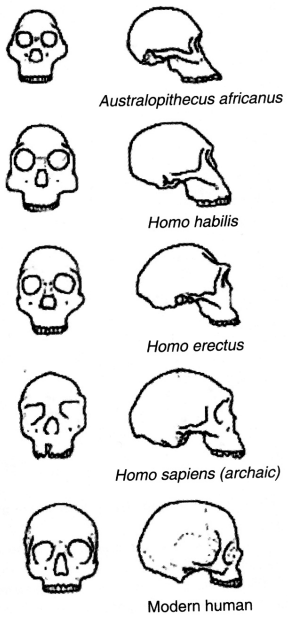

চিত্র ৪ ঃ অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের আকার ও আয়তনের পরিবর্তন

থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে। ভাষা, প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগে 'শ্রুতি' রূপে শিক্ষাকে বহন করেছে, আর ঐতিহাসিক যুগে 'শ্রুতি'র সঙ্গে 'লিপি' রূপে বহন করছে। প্রাকৃতিক কারণে কখনো কখনো কোথাও কোথাও 'শ্রুতি' স্তব্ধ হয়ে গেলেও 'লিপি' তা অবিচ্ছিন্ন রেখেছে।

কিন্তু, এই ভাষা মানুষ কিভাবে আবিষ্কার করল?

ভাষা একটি সামাজিক আবিষ্কার। সম্ভবত হোমো হ্যাবিলিসরা পশু শিকার করে জীবন ধারণ করত। অনেকে মিলে অতিকায় হিংস্র জীব-জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এবং পরবর্তীতে বড় বড় পশু শিকার করার সময় নিজেদের কাজের সমন্বয় ও সহযোগিতার জন্য দ্রুত ভাবের বিনিময়-এর প্রয়োজন ও চেষ্টায় মানুষ ভাষার আবিষ্কার করেছিল। আদিম যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীগুলি একই প্রয়োজনে ও তাগিদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি করেছিল। মানুষের মুখে ভাষা ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজন হয়েছিল – উন্নত মস্তিষ্কের, বাক্‌যন্ত্র ও জিভের সমন্বয়ের, কান ও জিভের সমন্বয়ের, নির্দেশ – উপদেশ – উত্তর – প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়োজনে। যেমন কান – জিভ – বাক্ যন্ত্রের সমন্বয় সাধন ঘটেছিল মস্তিষ্কে, ঠিক তেমনি কানে শুনে নির্দেশ পালনে জন্য কান ও হাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটেছিল। এই কারণেই লিপি আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। মানবমস্তিষ্কে স্নায়ুতন্ত্রের এই রূপ সমন্বয় সাধনের জন্যই হোমো হ্যাবিলিসের মস্তিষ্কের ক্রেনিয়ানের মাপ (৪৫০-৬০০) সিসি হয়েছে (চিত্র ৪)। পাখিরা একমাত্র প্রাণী যারা কথা বলা শিখতে পারে, কথা অনুকরণ করতে পারে। কিন্তু কথার মাধ্যমে নিজের ভাব প্রকাশ উন্নত ও সুসংবদ্ধভাবে করতে পারে না।

ভাষা বংশগতভাবে অর্জিত হয় না, সমাজ (পরিবেশ) থেকে শেখা হয়, কিন্তু ভাষা শিক্ষার জন্য মস্তিষ্কে স্নায়ুর গঠন বংশগতভাবেই সঞ্চারিত হয়। অন্ধ–বধির–মূক, হেলেন কেলার, এর পক্ষে পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল অভিব্যক্তির মাধ্যমে বংশানুক্রমিকভাবে অর্জিত আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের উপস্থিতির জন্যই। তবে তাঁর 'হেলেন কেলার' হয়ে ওঠার পিছনে তাঁর শিক্ষিকা অ্যানি স্যালিভ্যান-এর অবদান – আর এক মানব মস্তিষ্কের চূড়ান্ত অনুশীলনের প্রকাশ। আইনস্টাইনের মতে, "অ্যানির কীর্তি, আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার-এর চেয়েও বড়। ... "

২) হাতিয়ারের ব্যবহার

মানুষের মস্তিষ্কের অর্ধেক জুড়ে রয়েছে, চোখ ও হাতের কাজের সমন্বয় রক্ষাকারী ব্যবস্থা। হাতিয়ার ব্যবহার এর প্রয়োজনীয়তা ও চেষ্টা যেমন প্রাথমিকভাবে এই সমন্বয়কারী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তেমনি আবার মানুষের মস্তিষ্কে চোখ ও হাতের কাজের সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্যই পরবর্তী সময়ে মানুষ উন্নত হাতিয়ার ও যন্ত্র বানাতে সক্ষম হয়েছে। হোমোসেপিয়ান সেপিয়ানরাই প্রথম হাতিয়ার তৈরীর হাতিয়ার বানিয়েছিল। কেননা মানুষ ভাষার মাধ্যমে চিন্তা করতে পেরেছে। তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি থেকে চিন্তার উদ্ভব এবং চিন্তার মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবিলার সূচনা হয়। সুতরাং বস্তু থেকেই চিন্তার উদ্ভব, চিন্তা থেকে বস্তু নয়। এ সবকিছুই মানুষ অর্জন করেছে লক্ষ লক্ষ বছরের ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শ্রমের মাধ্যমে। প্রতিটি প্রজাতির প্রাণী নিজ নিজ খাদ্য সংগ্রহে শ্রম দেয় ব্যক্তিগতভাবে – সমষ্টিগতভাবে নয়। তাই সামাজিক শ্রমের সুফলগুলি তারা অর্জন করতে পারে নি। আদিম যুগে, শিকার করা দ্রব্য, মানুষ নিজেদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করত। সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টনের প্রয়োজনীয়তা ছিল – দুর্বল মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকের প্রত্যেককে প্রয়োজন ছিল।

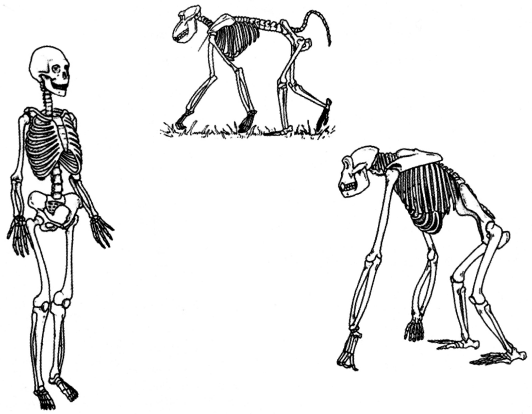

চিত্র ৫ ঃ মানুষের বিবর্তন চারপেয়ে থেকে দুপেয়ে হওয়া।

মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরা শক্ত খাবার ভেঙ্গে খাওয়ার জন্য দাঁতের ব্যবহার করে। ফলে এদের দাঁত ও চোয়াল শক্তিশালী হয়েছে আর আদিম মানুষ শক্ত খাবার হাতিয়ারের সাহায্যে ভেঙ্গে টুকরো করে খেত। ফলে মুখের ওপর চাপ কমে যাওয়ায় চোয়াল ছোট হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। মানুষ ছাড়াও কিছু এপ জাতীয় প্রাণীকে হাতিয়ারের সাহায্যে শক্ত খাদ্য ভাঙতে দেখা যায়।

দুটি প্রাণীর লড়াইয়ের সময় প্রাণী দুটির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়। মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে হাতিয়ার – যা অস্ত্ররূপে মানুষের পক্ষ নিয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে জয়ী করে তুলেছে। এক্ষেত্রে মানুষের জীবন সংগ্রাম প্রকৃতি নির্ভর থাকল না।

পরিবেশে প্রাকৃতিকভাবে বনভূমি হ্রাস পেয়ে তৃণভূমি বিস্তার লাভ করলে, প্রাইমেটদের যে শাখাটি, সমতলভূমিতে নেমে আসে এবং কালক্রমে মানুষে রূপান্তরিত হয়, প্রাথমিকভাবে তারা দ্বিপদ গমন পদ্ধতি অর্জন করে এবং পরবর্তীকালে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে (চিত্র ৫)। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত ফসিলে কঙ্কাল তন্ত্রের গঠন (চিত্র ৬) দেখে ও তার বয়স নির্ণয় করে এটা অনুমান করা হয়। মানুষের পক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারাটা সম্ভব হয়েছিল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পরিপূর্ণ হাতিয়ারের ব্যবহারের তাগিদ এবং আত্মরক্ষামূলক দূরত্ব বজায় রেখে শত্রুর মোকাবিলা করার তাগিদ থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারায় হাতের মুক্তি ঘটে এবং সে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়।

আত্মরক্ষার কাজে হাতিয়ারের ব্যবহার, ঐ কাজে দাঁতের ব্যবহারকে অস্বীকার করল। ফলে দাঁত ছোট হয়ে এলো – চোয়াল ছোটো হতে পারল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে রামাপিথেকাস এর ফসিলে দেখা গেছে, শ্বদন্তগুলি ছোটো।

৩) আগুনের ব্যবহার

আগুনের ব্যবহার ও সংরক্ষণ মানুষকে এগিয়ে দিল অনেকটা। হোমোইরেকটাস পর্যায়ে মানুষ আগুনের ব্যবহার শুরু করে। মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পাবার যে বাস্তব চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল, পোড়া ও সিদ্ধ খাবার নরম হওয়ায় চোয়াল আরও ছোটো হয়ে তাকে সম্ভব করে তুলল। হোমোইরেকটাস-এর ক্রেনিয়ানের মাপ হল ৭৭৫-১২২৫ সিসি। চোয়াল ছোট হলেও দাঁত ছোট হয়ে যাওয়ায় জিভ নড়ার জন্য যথেষ্ট জায়গা পেল। ফলে উচ্চারণ ধ্বনি স্পষ্ট হল। প্রাইমেটদের যে শাখা থেকে মানুষের আবির্ভাব তারা ছিল শাকাহারী। তাই প্রথমদিকে হাতিয়ারের ব্যবহার ছিল শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য। পরবর্তীতে খাদ্য সংকটের যুগে মানুষ মাংসাশী হয়ে উঠলে শিকারের কাজে হাতিয়ার ব্যবহার হত। তীর ধনুকের ব্যবহার শিকারকে সহজ করে তোলে। শিকারের অভাবের জন্যই একটা পর্যায়ে মানুষ কবর দেওয়া মৃত নরমাংস এবং অন্যান্য মৃত পশু ভক্ষণ করত বলে অনুমান করা হয়। খাদ্য তালিকায় প্রাণীজ প্রোটিনের সংযোজন মস্তিষ্ক বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। পোড়া

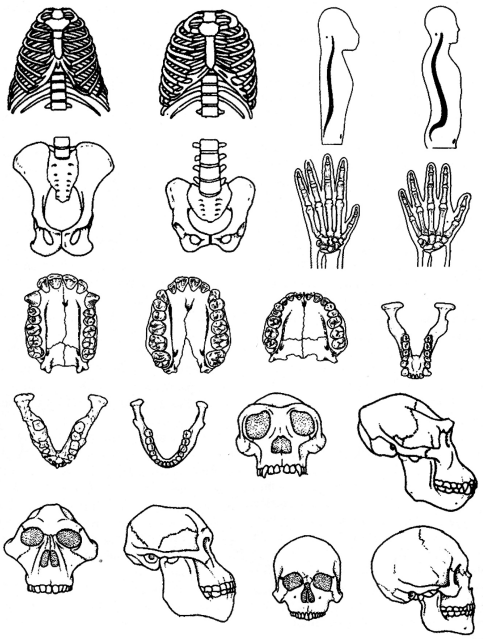

চিত্র ৬ ঃ আধুনিক মানুষ এবং অস্ট্রালোপিকাস-এর বিভিন্ন অঙ্গের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের তুলনা।

বা সিদ্ধ মাংস পরিপাকের সহায়ক হয়েছিল। পর্যায়ক্রমে কাঁচা খাবার খাওয়ার অভ্যাস বর্জন এবং রান্না খাবার খাওয়ার অভ্যাস অর্জন পরিপাকতন্ত্রে পরিবর্তন ঘটায়। বর্তমানে মানুষের অ্যাপেনডিক্স লুপ্তপ্রায় অঙ্গ কিন্তু তৃণভোজী প্রাণীদের ক্ষেত্রে তা নয়। আগুনের ব্যবহার শীতকালীন আবহাওয়ায় জীবনকে সহজ করে তুলেছিল। শিকারের কাজেও আগুনের ব্যবহার শুরু হল। আগুনের ব্যবহার হিংস্র জীবজন্তু তাড়িয়ে মানুষকে গুহা দখল করতে সাহায্য করেছিল। গুহার ভিতরকার পরিবেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঝড়, জল, বৃষ্টি) থেকে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় দিল। অন্ধকার গুহার ভিতরে চিত্র অঙ্কন আগুনের আলোতেই সম্ভব হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গুহাচিত্রগুলিতে পশুশিকারের নমুনাই পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় অর্জিত 'হাতে কলমে' শিক্ষাকে ধরে রাখা ও পরবর্তী প্রজন্মকে তা শেখানোর প্রচেষ্টায় গুহাচিত্রগুলি তৈরী করা হয়েছিল – যা অবশ্যই তাদের অবসর সময়ে সম্ভব হয়েছিল। এই ছিল মানবজাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির সূচনা যা অন্য কোন প্রজাতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি।

(৪) পশুপালন

মানুষের খাদ্য তালিকায় মাংস অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলেই পশুপালন শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে কুকুর পোষা শুরু হয় শিকারের কাজে সাহায্য করার জন্য। এই পশুপালনের ফলে মানুষ প্রকৃতির খাদ্য সম্ভারের শুধুমাত্র ধ্বংসসাধন না করে সংযোজন করতে শুরু করে। তার খাদ্য তালিকায় মাংসের সাথে যুক্ত হল ডিম ও দুধ। আগুনের ব্যবহারের ফলে সে রান্না করতে শিখেছে যা ছিল রসায়ন চর্চার হাতেখড়ি। পশু পালনের মধ্য দিয়ে শিকার ছাড়াও মাংসের যোগান সম্ভব হয়েছিল। খাদ্য তালিকায় আমিষ খাদ্য যুক্ত হওয়ায় চিন্তাশক্তি ও শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির কারণেই মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে পোষাক একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার । আবার এর ফলেই প্লাইস্টোসিন বরফ যুগের মাস এক্সটিংকশন থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছিল। মানুষ ছাড়া অন্য যেসব প্রাণী সবরকম আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল – সেগুলি হল গৃহপালিত পশু এবং কীটাদি (জীবাণু) তা সম্ভব হয়েছিল মানুষের পিছনে চলতে চলতে। পশু পালনের ফলেই মানুষ অসচেতনভাবে গৃহপালিত পশুগুলির সাথে সম্পর্কিত অন্য প্রজাতির পশুদের আন্তঃ প্রজাতির সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

শিকারী জীবনে আদিম মানুষ এক একটি গোষ্ঠীর একটি পশু বা একটি ফল বা একটি গাছকে **'টোটেম'** বলে স্বীকৃতি দিত। টোটেম স্বীকৃত জীবটিকে ঐ গোষ্ঠীর মানুষ ভক্ষণ করবে না এবং তার বৃদ্ধি কামনা করবে। এই নিষেধটি হল ঐ গোষ্ঠীর **'টাবু'**। ফলে ঐ জীবটির পরিমাণগত বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হল। প্রতিটি গোষ্ঠীর 'টোটেম' পৃথক পৃথক ছিল। 'টাবু' – বিধিনিষেধের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনাকে হ্রাস করেছিল। পরবর্তীকালে ঐ চিন্তাভাবনার বাস্তব উন্নতি ঘটে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য বস্তুকে সংরক্ষণ করে। অন্য কোনো প্রাণী সচেতনভাবে সংরক্ষণ করতে পারে না যদিও পিঁপড়ে এবং ইঁদুর প্রজাতির মধ্যে সংরক্ষণ করার দিক লক্ষ্য করা যায়।

(৫) কৃষির আবিষ্কার

ঐতিহাসিকদের মতে আজ থেকে ৮-১০ হাজার বছর আগে নবপ্রস্তর যুগে কৃষির আবিষ্কার হয়। সুতরাং কৃষির আবিষ্কার হয়েছে হোমো সেপিয়ান সেপিয়ান পর্যায়। হাতিয়ারের উন্নতির ফলে যখন থেকে শিকারের কাজে নারীর প্রয়োজনীয়তা কমল তখন থেকে মেয়েরা শিকার ব্যতীত ঘর সংসারের সব কাজ করত। তাছাড়া সন্তানধারণ ও প্রসবের পরে শিশুকে লালন পালন করতে মানুষের ক্ষেত্রে অনেকটা বেশী সময় লাগে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে বসতির নিকটবর্তী অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্ভিদের জীবনচক্র পর্যবেক্ষণ করা তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। তাই কৃষিকাজ সম্ভবত মেয়েদেরই আবিষ্কার। প্রাথমিকভাবে কৃষিকাজ মহিলাদের কাজ হিসাবে সূচনা হলেও কৃষিতে হাল-বলদের প্রয়োজন কৃষিকে পুরুষদের কাজে রূপান্তরিত করে।

কোনোদিনই পৃথিবীর সর্বত্র একইরকম প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিলনা। ভৌগোলিক কারণেই এটা সম্ভব নয়। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পূর্ব গোলার্ধে গৃহপালনের যোগ্য প্রায় সব জন্তু এবং একটি ছাড়া প্রায় সব চাষযোগ্য খাদ্যশষ্য ছিল। পশুপালনের সূচনা পশুখাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছিল। তাই পূর্ব গোলার্ধে গৃহপালিত পশুর খাদ্য যোগানের তাগিদ থেকে কৃষিকার্যের সূচনা হয় এবং পরবর্তীকালে কৃষিকার্য মানুষের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা মেটায়। কিন্তু পশ্চিমগোলার্ধে পালনযোগ্য একটিমাত্র পশু (লাম্মা) ছাড়া কিছুই ছিলনা এবং চাষযোগ্য একটিমাত্র খাদ্যশষ্য ভুট্টা পাওয়া যেত। ফলে পশ্চিমগোলার্ধে মানবখাদ্য সংগ্রহের প্রধান উপায় হয়ে উঠল কৃষিকার্য। পূর্ব গোলার্ধে **আর্য** ও **সেমিটিক** জাতিগুলির খাদ্য তালিকায় প্রধানভাবে ঘি, দুধ, ডিম, মাংস যুক্ত হওয়ায় এবং এই প্রয়োজনীয়তা মেটাবার জন্য পশু খামারের সৃষ্টি সম্ভবত পৃথিবীর

অন্যান্য জাতিগুলি থেকে এদের কিছুটা পৃথক করে দিয়েছিল। বস্তুতঃ নিউমেক্সিকোর পুয়েব্লো ইন্ডিয়ানরা, যারা প্রায় নিছক নিরামিষভোগী ছিল, তাদের মস্তিষ্কের আকার ও আয়তন, আর্য ও সেমেটিক জাতিগুলির মস্তিষ্ক অপেক্ষা ছোট ছিল। কৃষির আবিষ্কারই নরমাংসভোজন বন্ধ করে, যদিও ধর্মীয় আচারে তা বহুদিন টিঁকে ছিল।

পশুপালন যেমন সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পশুর নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনাকে রোধ করেছিল, কৃষিকার্যের আবিষ্কার তেমন খাদ্য উৎপাদনের সূচনা ঘটিয়েছিল, যদিও তা ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর। আর এই প্রকৃতি নির্ভর কৃষিই ছিল প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রকৃতিকে ব্যবহার করার সূচনা। প্রকৃতির ভান্ডারে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাদ্য বস্তুর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল জীবন ধারণের প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়ল। ছেদ পড়ল মানুষের যাযাবর জীবনে। এই উৎপাদনের সূচনাই প্রকৃতির খাদ্য-খাদক সম্পর্ককে মানুষের ক্ষেত্রে **উৎপাদন-খাদক সম্পর্কে** রূপান্তরিত করল। প্রকৃতি নির্ভর 'প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ' মানুষের ক্ষেত্রে আরও একটা বড় ধাক্কা খেল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কৃষিকে নির্ভর করে প্রধাণতঃ নদী অববাহিকায় গড়ে উঠল মানব সভ্যতা।

যে প্রকৃতি মানুষকে সমাজবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিল সমাজবদ্ধ জীবনই আবার সেই প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে শুরু করে। ক্রমে মানুষের জীবন প্রকৃতি নির্ভর অপেক্ষা সমাজ নির্ভর হয়ে পড়ে।

(৬) ঘরবাড়ী ও পোশাক

গৃহনির্মাণ ও পোশাকের ব্যবহার কবে থেকে ও কিভাবে শুরু হয় তা নিয়ে নানান মতামত আছে। তবে বেশীর ভাগের মতে প্লাইসটোসিন তুষারযুগ বা শীতকালীন আবহাওয়ায় পোশাকের প্রচলন শুরু হয়। যদিও পশুপালন শুরু হবার পরে তা ঘটেছে বলেই অনুমান করা হয়। গুহাবাসের উপকারিতা মানুষকে ঘরবাড়ী নির্মাণের দিকে চালিত করে। গুহা থেকে প্রথমে পশুচামড়ার তাঁবু তারপর গাছপালা দিয়ে গৃহনির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। আবার দীর্ঘদিন ধরে পোশাকের ব্যবহার একদিকে মানুষের ত্বকের কিছু পরিবর্তন ঘটায় অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বোধেরও পরিবর্তন ঘটায়, যার ফলে লজ্জা নিবারণের জন্য পোশাক হয়ে ওঠে বারো মাসের সাথী। সেক্স নিয়ন্ত্রণে লজ্জাবোধ সম্ভবত পোশাক ব্যবহারের ফলেই গড়ে উঠেছিল।

চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পোশাক এবং গৃহ দুটোই প্রয়োজন হয়েছিল। গুহাবাসের অভিজ্ঞতা এবং মস্তিষ্কের বিকাশ হাতের মাধ্যমে গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ করেছিল। পাখিরাও ঘর বানায় তবে তা ডিম পাড়া ও ডিম ফোটানোর জন্য। গৃহ নির্মাণ মানবজীবনে প্রকৃতির সাথে সংগ্রামকে সহজ করে দিয়েছিল, সহজ করে দিয়েছিল খাদ্য বস্তু সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে। যার ফলে মানব সভ্যতার সূচনা সম্ভব হয়েছিল। গৃহ হ'ল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশ যা মানবজীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবকে চূড়ান্ত হতে দেয়নি। ঘরের মধ্যের তাপমাত্রা বাহ্যিক পরিবেশের তাপমাত্রা অপেক্ষা পৃথক হ'য়ে পড়ায় মানুষের সেক্স প্রাকৃতিক পরিবেশ (তাপমাত্রা) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে গৃহের অভ্যন্তরের পরিবেশ (তাপমাত্রা) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া শুরু হল; ফলে মানুষের সেক্স সম্পূর্ণভাবে 'ঋতুনির্ভর, না থেকে সারা বছর ধরে সম্ভব হ'ল। এর ফলে প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ সমস্ত প্রাণীর থেকে বহুধাপ এগিয়ে গেল। বর্তমান যুগের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এই আবিষ্কারগুলি মানুষকে এতটাই এগিয়ে দিল যে মানুষ ও তার পূর্বপুরুষের সম্পর্ককে বিশ্বাসযোগ্য বলে মন মানতে চায়না। শুয়োপোকা থেকে প্রজাপতি, (অভিব্যক্তির পথে অর্জিত মেটামরফসিস বা রূপান্তর) সম্পূর্ণ জীবনচক্র ছোট সময়ের মধ্যে হওয়ায় তা বিশ্বাসযোগ্য হয়। আর মানুষের "মানুষ হয়ে ওঠা' লক্ষ লক্ষ বছরের পর্যায়ক্রমিক অভিযোজন ও অভিব্যক্তির ফল বলে মানুষ তথা কোনো প্রাণীরই জীবনচক্রে তা ধরা পড়া সম্ভব নয়। প্রকৃতিতে সংরক্ষিত জীবাশ্ম ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বিশ্লেষণ দ্বারাই তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের উপজাতিদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, আইন, রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে আদিম পর্যায়ে সভ্য মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। আদিম উপজাতিগুলিকে বলা যায় আদিম মানুষের 'জীবন্ত জীবাশ্ম' স্বরূপ। মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে বিবাহের (যৌন সম্পর্কের) রূপের পরিবর্তনের কোনো সম্বন্ধ নেই। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উপর ভিত্তি করে সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিবাহ সম্পর্কের রূপান্তর ঘটেছে। পরিবারের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। পরিবারের মধ্যে পিতা, মাতা, ভাই, বোন, মামা, মাসি, কাকা, পিসী, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি সম্বোধনগুলি একেকটি নির্দিষ্ট সম্পর্ককে নির্দেশ করে যার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক দায় দায়িত্ব বন্টিত হয়, অবাধ যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ

	হোমো হ্যাবিলিস	〈	হোমো ইরেকটাস	〈	হোমো সেপিয়ান	〈	হোমো সেপিয়ান সেপিয়ান
ক্রেনিয়ানের মাপ	৪৫০-৬০০ সিসি		৭৭৫-১২২৫ সিসি		১১০০-১৪৫০ সিসি		২৩০০ সিসি

হয়। পরিবারের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় জিনের মিশ্রণের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় যা প্রাকৃতিক নির্বাচনে সামাজিকভাবে মানুষকে আরও যোগ্য করে তোলে। এইভাবেই সমাজ-সংস্কৃতি মানুষের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। হোমো হ্যাবিলিস থেকে শুরু করে হোমো সেপিয়ান সেপিয়ান-এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ সামাজিক সহযোগিতা, ঐক্যবদ্ধভাবে হাতিয়ারের ব্যবহার ও তার ফলাফল প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিল। ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে মানুষ অর্জন করল উন্নত মস্তিষ্ক।

সমাজবদ্ধ জীবনে, যে সামাজিক আবিষ্কারগুলি হোমো হ্যাবিলিসকে হোমো সেপিয়ান সেপিয়ান রূপান্তরিত করেছিল, তা ডারউইনের অন্তঃ প্রজাতি সংগ্রামকে নাকচ করে দিয়েই সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে অন্যান্য জীবজন্তুকে মানুষ পিছনে ফেলে দিয়েছিল।

মানব জীবনে, এই আবিষ্কারগুলি, মানব মস্তিষ্কের বিকাশ এমন মাত্রায় ঘটিয়েছিল যে, মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির অনুভূতি পশুর ইন্দ্রিয়গুলির অনুভূতি অপেক্ষা পৃথক হয়ে পড়ে। যেমন ঈগল পাখীর চোখ, মানুষের চোখের চেয়ে শক্তিশালী এবং তারা বহুদূর দেখতে পায়। কিন্তু মানুষের চোখ, ঈগলের চোখের চেয়ে অনেক বেশী উপলব্ধি করতে পারে বস্তুর স্বরূপ। অধিকাংশ প্রাণী বর্ণান্ধ। মানুষ তা নয়, যদিও কোনো কোনো মানুষ বর্ণান্ধ (বংশগত কারণে) হয়। বর্ণ, হল বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর পৃথক পৃথক অনুভূতি। যা মানুষের পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া সুর, তাল, ছন্দ বোধ মানুষের আছে, অন্য কোন প্রাণীর নেই। প্রাণীদের মধ্যে মানুষই একমাত্র 'হিউমার' বা মজা করতে পারে। এই সংস্কৃতিবোধের ক্রমান্বয় বিকাশ মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে।

অন্যান্য প্রাণীরা পরিস্থিতি বা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে কাজ করতে পারে না। বাহ্যিক উদ্দীপকের প্রভাবে সাড়া দেওয়া, আর মস্তিষ্কের মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা – দুই পৃথক বিষয়। স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশের অনুপাতে সচেতন পরিকল্পিত ক্রিয়া সম্ভব। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টা অনেকটা উন্নত। মানব শিশুর ক্ষেত্রে, মাতৃগর্ভে মস্তিষ্কের বিকাশ যে মাত্রায় ঘটে, জন্মের পর তা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

মানব মস্তিষ্কে, উন্নত, জটিল সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমন্বয় সাধন ঘটে, যার ফলে সূক্ষ্মঅনুভূতি উপলব্ধি করা, কল্পনা করা ও চিন্তা করা সম্ভব হয়েছে। এই বিষয়ে ভাষার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানব শিশুর জন্মের বেশ কিছু দিন পরে ভাষা আয়ত্ত করে। (চিত্র ৭)

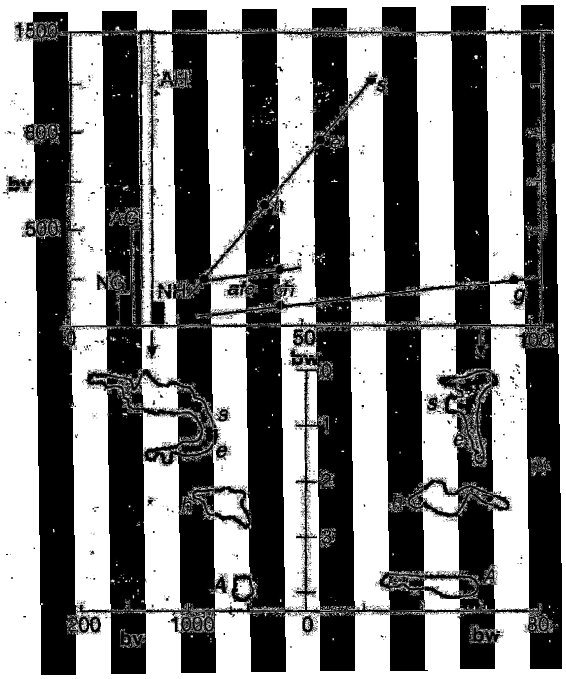

চিত্র ৭ ঃ গরিলা ও মানুষের শিশুর মস্তিষ্কের আয়তন (bv), ওজন (bw)-এর তুলনা
AH আধুনিক মানুষ। NH প্রাচীন মানুষ
AG আধুনিক গরিলা। NG প্রাচীন গরিলা

মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মস্তিষ্কের বৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও - মস্তিষ্কের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর শিশুদের তুলনায় অনেক বেশী সময় লাগে, কারণ মানব শিশুর পরিপূর্ণ মস্তিষ্কের আয়তন ও স্নায়ু তন্ত্রের সমন্বয়-বিন্যাস অনেক বেশী জটিল ও উন্নত। এই কারণে, অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের তুলনায় মানব শিশুর দুধে দাঁত অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে, স্থায়ী দাঁত দ্বারা অপসারিত হয়।

সামাজিক শ্রম ও হাতিয়ারের ব্যবহার মানব মস্তিষ্কের এরূপ বিকাশ ঘটিয়েছে। আর এই ক্রম বিকশিত মস্তিষ্ক, আত্মরক্ষার হাতিয়ারের ক্রমাগত উন্নতি ঘটিয়েছে-যা আত্মরক্ষার অঙ্গের প্রয়োজনীয়তাকে পর্যায়ক্রমে অস্বীকার করেছে। এই কারণে মানব শিশুকে লালন-পালন করতে হয় দীর্ঘ দিন। যদিও সামাজিক-আর্থিক স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের শিশুদের শৈশবের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

মানব-মস্তিষ্কের এই রূপ বিকাশ, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা বর্জনকে নাকচ ক'রে, সামাজিকভাবে গ্রহণ করেছে। এর উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন বৈজ্ঞানিক স্টিফেন হকিং। হকিং এর মস্তিষ্কের অনুশীলনের ফলাফলগুলি সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। যদিও মানব জাতির অধিকাংশের মস্তিষ্ক'র অনুশীলনের ক্ষেত্র সামাজিকভাবেই রুদ্ধ।

কৃষি ও পশুপালন খাদ্য সমস্যার আপাত সমাধান করায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ছোট ছোট এলাকা ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পুনরায় খাদ্য সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে শ্রমের শ্রেণীবিভাজন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আপাত সমাধান করলেও পুনরায় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়ে যা পুনরায় অন্তঃপ্রজাতির সংগ্রামকে এক নতুন রূপে (শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম রূপে) মানব প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত করে। সমাজ নির্ভর মানব জীবন সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রকৃতির মধ্যে "জীবন সংগ্রাম", সমাজের মধ্যে "জীবিকার সংগ্রামে" রূপান্তরিত হল।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, সমাজের নিয়ম নীতি, আইনকানুন, সাংস্কৃতিক বোধ উৎপাদনের বৃদ্ধি সমাজের পরিচালক শ্রেণীর স্বার্থে ঘটতে থাকে। সমগ্র মানব প্রজাতির অগ্রগতি রূপান্তরিত হয়, পরিচালক শ্রেণীর অগ্রগতিতে। মানুষে মানুষে সহযোগিতার সম্পর্ক রূপান্তরিত হয় উৎপাদন সম্পর্কে। এই উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ তীব্র হ'লে বাস্তব পরিস্থিতিতে উৎপাদন সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে যা পূর্বের বিরোধ ও প্রয়োজনের সমাধান ঘটায়। কিন্তু সমাজ শ্রেণীবিভক্ত থাকায় নতুন উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেও বিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীতে দাসব্যবস্থা থেকে সামন্তব্যবস্থা, সামন্তব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং কোথাও কোথাও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। যদিও পৃথিবীর সর্বত্র একই সঙ্গে, একই সময়ে একই রকম সমাজব্যবস্থা বিরাজ করেনি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী ব্যবস্থা অপেক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছাড়া শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বাকী সবক্ষেত্রেই এই উৎপাদনের বিকাশ প্রকৃতি নির্ভর ও ব্যক্তিগত ভোগের লক্ষ্যে ঘটেছে। ফলে তা সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর উৎপাদনের বিপুলতার আন্দাজ ডারউইন করতে না পারায় ম্যালথাসের 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সংকটের কারণ' তত্ত্বকে সমর্থন করেন। কার্ল মার্কস বলেছিলেন "ম্যালথাসের মানুষের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।" নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, বর্তমান যুগের দুর্ভিক্ষ উৎপাদনের অভাবের জন্য ঘটে না, ঘটে অর্থের অভাবে উৎপাদিত পণ্য কিনতে না পারার কারণে। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি ও তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ, উৎপাদনের বৃদ্ধিকে এমন মাত্রায় উন্নতি করেছে যে উৎপাদিত পণ্যের ধ্বংস ব্যতিত উৎপাদন পদ্ধতি টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের বিকাশ, 'অতি উৎপাদনের সংকট' সৃষ্টি করেছে। যা সমাজ ও সমাজ নির্ভর মানুষের অগ্রগতিতে 'শ্রেণীভেদ' প্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করে। সুতরাং বর্তমানে সমগ্র মানবজাতির বিবর্তন অর্থাৎ অগ্রগতি 'শ্রেণীহীণ' সমাজ গঠন ও তার প্রগতির উপর নির্ভরশীল।■

ক্যানসার ও মানব সমাজ

–উৎপল ভট্টাচার্য

ক্যানসার কি – এনিয়ে বহু মানুষের মনে আজও নানা ধরনের প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। তবে মানুষ এটা জানে যে, যার এই রোগটি হয় সে নিজে এবং তার পরিবার দুপক্ষই মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়। রোগী নিজে মৃত্যুর প্রহর গোনে কারণ বর্তমান সমাজে এই রোগটিকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি চালু নেই, যা নিশ্চিতভাবে বলতে পারে ক্যানসার সম্পূর্ণরূপে সারিয়ে তোলা সম্ভব, আর এই সামগ্রিক চেষ্টার মধ্য দিয়ে রোগীর পরিবারের প্রতিটি মানুষের মন ভেঙ্গে যায়, খরচবহুল চিকিৎসা জীবিত পরিবারকেও মৃতপ্রায় করে তোলে। তাই ক্যানসার রোগটি একটি সামাজিক বিষয়ও বটে। আসুন আমরা রোগটি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা করার চেষ্টা করি এবং সামাজিক কারণ কিভাবে এর সাথে যুক্ত তা বোঝবার চেষ্টা করি।

WHO বা World Health Organisation-এর একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, ২০০৮ সালে সারা পৃথিবীতে ১২.৭ মিলিয়ন মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হন এবং তাদের মধ্যে ৭.৬ মিলিয়ন মারা যান (১ মিলিয়ন মানে ১০ লক্ষ)। ভাবতে পারেন কিভাবে ক্যানসার আজ মারণ রোগে পরিণত হয়েছে!

আনুমানিকভাবে বলা যায় যে প্রাচীন মিশরে সর্বপ্রথম ক্যানসার চিকিৎসা শুরু হয়। যেহেতু সেইসময় অজ্ঞান করে শল্যচিকিৎসা করার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি তাই রোগীর জ্ঞান থাকা অবস্থাতেই উত্তপ্ত ধাতব অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত অংশটি পুড়িয়ে চিকিৎসা করা হত। এই অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগী মারা যেতেন। গ্রীসে ক্যানসার চিকিৎসা আরও উন্নতিলাভ করেছিল। ক্যানসার টিউমারের প্রস্থচ্ছেদের সাথে কাঁকড়ার আকৃতিগত মিল থাকার ফলে রোগটিকে **'কারসিনোস'** বলা হত। সে সময় গ্রীসে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল বলে চিকিৎসক হিপোক্রেটস বহিরাঙ্গে হওয়া বিভিন্ন ক্যানসারের বর্ণনা করেন। উনবিংশ শতকে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে ক্যানসার কোষের অপসারণ ক্যানসার চিকিৎসার একটি অঙ্গ হয়ে ওঠে। কিন্তু কি এই ক্যানসার এবং কিভাবে হয় তা – এপ্রশ্নগুলো এখনো রয়েই গেছে।

কোষের অপরিণত অবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন স্তূপাকারে জমা হয়ে উপবৃদ্ধি সৃষ্টি করে, একে টিউমার বলা হয়। এই টিউমার সৃষ্টির পর যদি কোষবিভাজন বন্ধ হয়ে যায়, তখন তাকে বিনাইন টিউমার বলে। তবে কখনো কখনো বিনাইন টিউমার দেহের বাকী অংশের উপর চাপ সৃষ্টি করে বলে একে অস্ত্রোপচার করে সরিয়ে ফেলতে হয়। কিন্তু টিউমারের কোষগুলি যখন কোষবিভাজন বন্ধ না করে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে নতুন নতুন টিউমার সৃষ্টি করে, তখন তাকে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বলে। ম্যালিগন্যান্ট কোষের এই বিশেষ অবস্থার নামই আসলে ক্যানসার। ম্যালিগন্যান্ট কোষের বিভাজিত হওয়ার এই বিশেষ ধর্মকে বলে মেটাস্টাসিস। অঙ্গ অনুযায়ী ক্যানসারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। বেশীরভাগ মানুষই ফুসফুস, পাকস্থলী, যকৃৎ, স্তন ও কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হন। শিশু অবস্থায় প্রধাণত তিন ধরনের ক্যানসার হতে দেখা যায় – লিম্ফোমিয়া, ব্রেন টিউমার ও লিম্ফোমাস। তবে লিউকোমিয়া বা রক্ত ক্যানসার টিউমার সৃষ্টি করে না, কারণ রক্ত তো বহমান। তা একস্থান থেকে অপরস্থানে বাহিত হয়ে রক্তকোষগুলি-কে ম্যালিগন্যান্ট ক'রে তোলে। ক্যানসার রোগটি সম্পর্কে তো সাধারণ পরিচিতি ঘটল, এবার আসুন দেখে নেওয়া যাক ঠিক কি কারণে বা কিভাবে সাধারণ কোষ ম্যালিগন্যান্ট কোষে রূপান্তরিত হয়। কারণটি জানলেই সেই কারণকে প্রতিরোধ করে রোগটির প্রতিরোধ সম্ভবপর হতে পারে।

আমরা জানি কোষের বিভাজন, বিভিন্ন কোষীয় ক্রিয়াকলাপ এবং স্থায়িত্ব সবকিছুই জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার এই জিনগত বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক হল DNA। বিভিন্ন পদার্থ আমাদের কোষের DNA-এর গঠনের পরিবর্তন ঘটায়। এই পদার্থগুলিকে বলে মিউটাজেন। যেহেতু DNA ই হ'ল জিনগত বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক, তাই এর পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে কোষের কার্যকলাপ, তার নিয়ন্ত্রণ–বিভাজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে কোষের অভ্যন্তরীণ গঠন, স্থায়িত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ভুল বার্তা যায়। কোষ বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে এবং নতুন কোষের গঠনে প্রচুর ত্রুটি দেখা যায়। যেসব মিউটাজেন DNA-এর পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্রোমোজোমের এমন পরিব্যক্তি

ঘটায় যে স্বাভাবিক কোষ ক্যানসার কোষে পরিণত হয়, তাদেরকে বলে কারসিনোজেন। তবে এই কারসিনোজেনের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই ক্যানসার হয়না, মাঝে কিছু সময় লাগে। এই সময়কে বলা হয় ইনকিউবেশন পিরিয়ড।

নির্দিষ্ট ক্যানসারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট কারণকে দায়ী করা যায় না। বিভিন্ন কারণে জিন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন–সংক্রমণ, তেজস্ক্রীয় বিকিরণ, শারীরিক কর্মশীলতার অভাব, স্থূলতা, পরিবেশ দূষণ, মাদকদ্রব্যের প্রভাব ইত্যাদি। খুব কমক্ষেত্রে বংশগত কারণে ক্যানসার হতে দেখা যায়। জার্মান বিজ্ঞানী Theodor Boveri ক্যানসারের জন্য জিনের ভূমিকা, পর্যায়সমূহ প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান কিভাবে ত্রুটিপূর্ণ ক্রোমোজোম থেকে প্রচুর সংখ্যক ক্যানসার কোষ সৃষ্টি হয়। তিনি প্রস্তাব করেন যে এইসমস্ত ক্যানসার কোষগুলি অসীম বিভাজন ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই কোষীয় বৈশিষ্ট্য পরবর্তী কোষগুলিতেও সঞ্চারিত হয়।

বিভিন্ন রাসায়নিক কারসিনোজেনগুলির মধ্যে তামাক অন্যতম। তামাকের মধ্যে প্রায় ১৫ রকমের কারসিনোজেন থাকে। গত দশকগুলিতে তামাকসমৃদ্ধ ধূমপানের ফলে মৃত্যুর হার প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দেখা গেছে সক্রিয় ধূমপানের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর হল ধূমপান সরাসরি না করেও সেই ধোঁয়ার সামনে বসে থাকা।

আরেকটি শক্তিশালী রাসায়নিক কারসিনোজেন হ'ল 'অ্যালকোহল'। এর প্রভাবে দেহের বিভিন্ন অংশে ক্যানসার হয়। অ্যালকোহলের প্রভাবে আবার মুখের কলাকোষগুলির তামাকজাত কারসিনোজেন শোষণ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। তাই ধূমপান ও মদ্যপান দুটোই যারা করেন তাদের মুখ ও গ্রীবায় ক্যানসার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। স্বাভাবিক কোষ ও ক্যানসার কোষের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ক্যানসার কোষগুলি গোলকার আকার ধারণ করে এবং দুটি কোষের মধ্যে ফাঁক বেড়ে যায়। ফলে কোষগুলির লেগে থাকার ক্ষমতা কমে যায়, আলগা হয়ে যায়।

ক্যানসারের স্বাভাবিক লক্ষণের মধ্যে টিউমার সৃষ্টি হওয়া প্রাথমিক লক্ষণ। তবে মনে রাখতে হবে যে, সব টিউমার ক্যানসার নয়। কিন্তু যখন ক্যানসার মেটাস্টাটিক হয়ে পড়ে অর্থাৎ তা বিভিন্ন অংশে ছড়াতে থাকে, তখন হাড়ের কাছাকাছি অংশে ব্যথা, স্নায়বিক দুর্বলতা এসব লক্ষণও দেখা যায়। আগেই বলেছি যেসব ক্যানসার টিউমার সৃষ্টি না ক'রে ভিতরে ভিতরে বিস্তারলাভ করে তাদের লক্ষণ আলাদা হয়। যেমন- ক্ষুধামান্দ্য, ক্লান্তি, রক্তালপতা, খুব ঘাম হওয়া ইত্যাদি। তবে এইসমস্ত লক্ষণ দেখেই রোগটিকে নির্দিষ্টভাবে ক্যানসার বলে চিহ্নিত করা যায়না, কারণ এই লক্ষণগুলি অন্য আরও রোগের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তাই এক্ষেত্রে ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষাই একমাত্র উপায় রোগটিকে ক্যানসার বলে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার লম্বা ফর্দ আবার খরচ বহুল। তাই অনেক সময় তা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যায়। WHO প্রদত্ত সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ এভাবেই বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিচ্ছেন। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হলেও সাধারণ মানুষের কাছে এখনও তার সুবিধা পাওয়া কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার।

যাইহোক, ক্যানসার সৃষ্টির পিছনে ভাইরাস সংক্রমণেরও প্রভাব আছে। যেসমস্ত ভাইরাস ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে, তাদেরকে অঙ্কোভাইরাস বলে। আবার বিভিন্ন তেজস্ক্রীয় ও অতেজস্ক্রীয় বিকিরণের ফলে যেমন ক্যানসার সৃষ্টি হতে পারে, তেমনি ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অন্যান্য রোগ নির্ণয়ে তেজস্ক্রীয় ও অতেজস্ক্রীয় বিকিরণের দীর্ঘকালীন প্রভাবেও ক্যানসার সৃষ্টি হতে পারে। জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে তেজস্ক্রীয় বিস্ফোরণের ফলে ঐ অঞ্চলের বহু মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হন এবং তা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে চলেছে।

এছাড়াও বেশ কিছু যৌন হরমোন বেশী পরিমাণে থাকার ফলেও বিভিন্ন যৌনাঙ্গে ক্যানসার দেখা দেয়। দেখা গেছে যেসকল মহিলার স্তনক্যানসার হয়েছে, তাদের কন্যাসন্তানদের মধ্যে অস্বাভাবিকরকম বেশী ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরণ বর্তমান। সর্বোপরি বলা যায় যে, ক্যানসারের পিছনে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দায়ী কারণগুলো হ'ল বাহ্যিক (Environmental), খুব কমক্ষেত্রে বংশগত কারণকে দায়ী করা যায়।

আগেই বলেছি শরীরের বিভিন্ন স্থানে উপবৃদ্ধি বা টিউমার দেখে ক্যানসারকে প্রাথমিকভাবে চিনলেও শরীরের ভিতরকার অঙ্গগুলির ক্যানসার চিনতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। এগুলির মধ্যে এক্স রে, সিটি স্ক্যান, এন্ডোস্কপি, কোলোনোস্কপি ইত্যাদি পড়ে। অনেক সময় এইসমস্ত পরীক্ষাগুলি করার সময়েই সুক্ষ্ম নীড্‌ল দিয়ে উপবৃদ্ধির সামান্য অংশ কেটে বাইরে নিয়ে আসা হয়। তারপর সেই টুকরোর কোষগুলোকে পরীক্ষাগারে ভালোভাবে পরীক্ষা করে তা ক্যানসার কোষ কিনা এবিষয়ে নিশ্চিত হতে হয়। এই পদ্ধতিকে বায়োপসি বলে।

যেসমস্ত খাদ্য ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে সেগুলির বর্জন ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে কিছুটা আটকাতে

পারে। যেমন ফ্যাটজাতীয় খাদ্যগ্রহণের ফলে লিপিড সঞ্চিত হয়ে 'লিপোসারকোমা' বা লিপিড ও ফ্যাটসমৃদ্ধ কোষের ক্যানসার তৈরী করে। তবে এথেকেও আবার নির্দিষ্টভাবে বলা যায়না, যে মানুষটি নিয়মিত ঐ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর ক্যানসার হবেনা।

তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ক্যানসার চিকিৎসা বিষয়ক ব্যাপারে বিবিধ মত থাকলেও সম্প্রতি একটি আবিষ্কার সবার নজর কেড়েছে। সম্প্রতি গবেষণায় দুজন বিজ্ঞানী 'ডোপামিন' নামে এক যৌগকে ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহার করার প্রস্তাব রেখেছেন। দেখা যাক কিভাবে এই 'ডোপামিন' কাজ করে ক্যানসার কোষের বিরুদ্ধে। ক্যানসার চিকিৎসার সাধারণ পদ্ধতিই হ'ল রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপিতে যথাক্রমে তেজস্ক্রীয় বিকিরণ ও রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ম্যালিগন্যান্ট কোষগুলিকে ধ্বংস করা। তবে এই দুই ক্ষেত্রে কিছুটা সীমাদ্ধতা আছে। টিউমার তৈরী হওয়ার পর এর দ্রুত বৃদ্ধির জন্য কোষগুলি রক্তনালী তৈরী করে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহের জন্য। এই নতুন সৃষ্ট রক্তনালীতে গঠনগত নানান ত্রুটি থাকার ফলে তেজস্ক্রীয় বিকিরণ বা রাসায়নিক পদার্থ টিউমারের সমস্ত কোষগুলিকে ধ্বংস করতে পারে না। ডোপামিন টিউমারের এই রক্তনালীর ত্রুটিগুলোকে নষ্ট করে দেয়, ফলে তেজস্ক্রীয় বিকিরণ বা রাসায়নিক পদার্থগুলি ক্যানসার কোষগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। তবে এই দুই পদ্ধতিতেই টিউমারের পার্শ্ববর্তী ও শরীরের অন্যান্য অংশের স্বাভাবিক কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি আবার ক্যানসার চিকিৎসার একটি অন্যতম খারাপ দিক। অস্ত্রোপচার দ্বারাও ক্যানসারের কোষগুলিকে দেহ থেকে অপসারণ করা হয়। তবে সবটাই ক্যানসারের পর্যায় ও আক্রান্ত অঙ্গের গুরুত্ব বুঝে চিকিৎসকরা ঠিক করেন। চিকিৎসার ঠিক এই জায়গাটিতেই একটি অদ্ভুতরকম দ্বন্দ্বের দিক উঠে আসে। ধরা যাক্ এক ব্যক্তির ক্যানসার হয়েছে এবং অস্ত্রোপচারের পর তিনি মোটামুটি সুস্থ। অর্থাৎ ক্যানসার কোষগুলি একই জায়গাতেই সংঘবদ্ধ থেকেছে, মেটাস্টাসিস পর্যায়ে পৌঁছনোর আগেই অস্ত্রোপচার করে তা দেহ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। এই অবস্থায় রোগীটির ভবিষ্যতে ক্যানসার ছড়ানোর পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আটকাতে চিকিৎসকরা কেমোথেরাপি করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এই রাসায়নিক পদার্থের পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। ফলে পুনরায় শরীর অসুস্থ হল। অর্থাৎ এক অসুস্থতা থেকে বাঁচতে এমন এক ব্যবস্থা নেওয়া হ'ল যা নিজেই শরীরে আরেকটি ক্ষতি এনে দিল। মানব সম্পদকে রক্ষা করতে চিকিৎসকদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জই হয়ে দাঁড়ায় এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চিকিৎসা করা। কিন্তু বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রধানতঃ বেসরকারী হয়ে যাবার কারণে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে মানুষকে বাঁচানোর চেয়ে তাদেরকে নিয়ে ব্যবসা করে কর্তৃপক্ষ বা মালিক লাভের পাহাড় গড়ে। তাই যে রোগীটির হয়ত অস্ত্রোপচারের পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার সম্ভাবনা ছিল, সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও বিপুল দেনার জন্য, কারণ বেসরকারী হসপিটালগুলোতে এক একটি কেমোথেরাপির পিছনে মোটা টাকা লাগে।

আবার এই অস্ত্রোপচারের ফলে কখনো কখনো দেহের এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বাদ দিতে হয়। অনেক কমবয়সী মহিলা বন্ধ্যা হয়ে পড়েন। তাঁদের সন্তানসম্ভাবনা চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যায়। এইজন্য সেইসমস্ত মহিলাদের অনেকে সামাজিক নিপীড়নের শিকারও হতে হয়।

আজকালকার দিনে যেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সেখানেও ক্যানসারের মত রোগ মারণরোগের আকার ধারণ করেছে। যার এই রোগটি হচ্ছে সে তো মৃত্যুর দিন গুনছেই, উপরন্তু তার পরিবার এই রোগকে সারিয়ে তুলতে সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার দেখুন সমাজে এধরনের মারণরোগ টিঁকে থাকলে, বেসরকারী হসপিটাল ও ঔষুধ কোম্পানিগুলোর লাভের পাহাড়ও ক্রমশ বাড়তে থাকে। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদের চেয়ে বড় হয়ে যায় তখন লাভ, লাভ, আরও লাভ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রগুলো পর্যন্ত নির্ধারিত হয় লাভকে মাথায় রেখে। তাই বর্তমান সমাজে রোগের সাথে মানুষের সংগ্রাম আজ নিস্প্রভ হয়ে গেছে মানুষের সাথে মানুষের জীবন সংগ্রামের কাছে। আজ সরকারও হাত তুলে দিয়েছে এবিষয়ে, যদিও সে নিজেকে জনগণের সরকার হিসেবে দাবী করে। তাই যদি হয় তবে কেন দেশের সরকার আজ জনগণের এই মৌলিক দাবীকে মেটাতে আগ্রহী নয়, কেন সে স্বাস্থ্য-চিকিৎসাকে বেসরকারীকরণ করে মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে ? মানুষের তিলে তিলে কষ্ট করে জমানো পয়সা যাতে সরকারী মহলের ফূর্তিতে না নষ্ট হয়ে আমজনতার প্রয়োজনের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় – আসুন আজ এই দাবীতে আমরা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি এবং ক্যানসারের মতো রোগের উপযুক্ত চিকিৎসার পরিকাঠামো গড়ে তুলি যেখানে রোগীর রোগ সারানোটাই উদ্দেশ্য হবে, লাভ-ক্ষতির অঙ্কটা থাকবে না।■

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক
মহাশয়,

নভেম্বর ২০১১ সমীক্ষণের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত "গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি মানুষের সৃষ্টি?" লেখাটি পড়লাম। এই বিষয়ে এতদিন যে সমস্ত লেখা বা বই পড়েছি তা থেকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে লেখাটি উপস্থাপন করা হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই এই লেখা আমার মতো অনেকের গ্লোবাল ওয়ার্মিং সংক্রান্ত ভুল ধারণাগুলিকে মেটাতে সমর্থ হয়েছে। এর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। শুধুমাত্র একটি বিষয়ে বলার আছে। আমার মনে হয়েছে লেখাটি কোথাও কি প্রথম বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির অবিবেচক, অনিয়ন্ত্রিত এবং ইচ্ছাকৃত পরিবেশের ক্ষতি করাকে সমর্থন করছে না?

ধন্যবাদান্তে
চঞ্চল রায়
শিক্ষক, সরশুনা হাইস্কুল

মাননীয় চঞ্চল বাবু,

পত্র মারফৎ, প্রশ্নবোধক সমালোচনার জন্য আপনাকে, সমীক্ষণের পক্ষ থেকে জানাই ধন্যবাদ। আপনার এই উদ্যোগে, সমীক্ষণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সার্থকতার পথে চালিত হল। "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" এর ন্যায় প্রাকৃতিক ঘটনাকে 'অ্যানথ্রোপোজেনিক' অর্থাৎ "মনুষ্য সৃষ্ট" বলে যে অপপ্রচার করা হচ্ছে, সেই অপপ্রচারের এবং অপপ্রচারের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করতেই রচনাটি রচনা করা হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই, "গ্লোবাল ওয়ার্মিং"টা যে প্রাকৃতিক ঘটনা সেটা প্রমাণ করা বেশী জরুরী হয়ে পরে। রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই, রচনাটির শিরোনাম ধার্য্য করা হয়। এ হলো পত্রিকার পক্ষ থেকে রচনাটি সম্পর্কে বক্তব্য।

আপনার পত্র, আমাদের সঠিকভাবেই ধরিয়ে দিয়েছে যে, এই রচনাটিকে হাতিয়ার করে, "প্রথম বিশ্ব" তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর ধারক-বাহকরা তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারে। এজন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।

ইচ্ছাকৃত তো দূরের কথা অনিচ্ছাকৃত ও শুধু শুধু পরিবেশে ক্ষতি করা (ভারসাম্য নষ্ট করা)-কে আমরা সমর্থন করি না। তবে মানব স্বার্থে শিল্পের বিকাশকে আমরা সমর্থন করি, সেক্ষেত্রেও অবশ্যই আমরা দূষণ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে। তবে "দূষণ নিয়ন্ত্রণ-এর দূষণ" যেন সমাজ প্রগতির অন্তরায় না হয়।

"সমালোচনা-আত্মসমালোচনা-আলোচনা" – 'সমীক্ষণ' পাঠকদের সঙ্গে এরূপ সম্পর্কই কামনা করে। এর মধ্য দিয়েই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। 'সমীক্ষণ' শুধুমাত্র সম্পাদকমন্ডলীর দ্বারা সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হতে পারে না। 'সমীক্ষণ'-এর পরিচালনা পাঠকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক – সকল পাঠক বন্ধুর প্রতি সম্পাদকমন্ডলীর এটাই আহ্বান।

ধন্যবাদান্তে
সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ

প্রিয় সম্পাদক

আপনাদের প্রকাশিত সমীক্ষণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাদে বাকি ৩টি সংখ্যাই পড়েছি, এবং বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রয়াস, উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারাকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গেই বলি যে বিজ্ঞান মনস্ক আয়োজিত ৬ই নভেম্বরের রসায়ন বিষয়ক অনুষ্ঠানটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম, এবং এই প্রসঙ্গেই কিছু কথা বলতে চাই, যা শুনতে মধুর না, তবে আপনাদের শুভানুধ্যায়ী হয়ে আমার বলাটা একান্ত প্রয়োজন।

বিজ্ঞান মনস্ক বা যে কোনও বৈজ্ঞানিক সংগঠন, যাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক বিষয়, ঘটনাবলী যা সংক্ষেপে বিজ্ঞান শাস্ত্রকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা, তাদের কাছে কিছু জিনিস অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হলে মন্ত্র একটাই - Fact should be provided, observations (with e.g. if necessary) should be cited, and reasons should be explained. এবং এই fact, observation কে হাতে হাত ধরে চলতে হবে, সমীক্ষন পত্রিকাটি উপরোক্ত মন্ত্রটি অক্ষরে অক্ষরেই পালন করে, কিন্তু ৬ই নভেম্বরের অনুষ্ঠান দেখে বেশ হতাশ হলাম। সমীক্ষণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছে বা পারার মত কাজ করছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, আর তাই এই অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল বিজ্ঞান মনস্ক'র একটি ভাল বিজ্ঞাপন হওয়া - যা সম্ভবপর হত আরো অনেক সংগঠিত, সুচারুভাবে অনুষ্ঠানের পরিচালনা করলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধতা তো দূর অস্ত বরং কিছু ভয়ঙ্কর গাফিলতি দেখা গেল - যা একটি বৈজ্ঞানিক সংগঠনের পক্ষে চূড়ান্ত বেমানান। অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে পারলে সমীক্ষণ পত্রিকার হাতে হাত ধরে বিজ্ঞান মনস্ক'র অভিযান একটা বড়সড় 'Impetus' পেতে পারত, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তার উল্টোটাই হল। একটু আগে যে 'মন্ত্র'টি বললাম, সেটিকে এখানে প্রাসঙ্গিক রেখে যদি বলা যায়, তাহলে বলতে হয় (১)

Facts দেওয়া হল, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল Fact দেওয়া হল, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দন্ডনীয় অপরাধ। (২) Observations'ও দেখানো হল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই Fact-এর সাথে Observation-এর মেলবন্ধন ঘটল না। (৩) Reasons বা ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি 'রসায়নের মজা' (Fun with chemistry)নামক অনুষ্ঠানের অংশটিকে Pin-Point করে বলব - অধিকাংশ ক্ষেত্রে Reasons দেওয়ার বদলে আরো বেশি জরুরি হয়ে পড়ল Excuse দেওয়া - কেন Experiment-গুলি সফল হচ্ছে না সেটা ব্যাখ্যা করতে। এই পয়েন্টে এটুকু বলাই বোধ করি যথেষ্ট।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই - বিজ্ঞান মনস্ক এখনও কিন্তু ওই প্রথম উদ্দেশ্য - সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এবং ভবিষ্যতে যদি বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র এবং আপনাদেরই আয়োজিত সভার মধ্যে এতটা তফাৎ থাকে, তাহলে ওই প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সাফল্য তো দূর-অস্ত, অসম্ভব বললেও বোধ হয় খুব একটা ভুল বলা হয় না। সমীক্ষণের সম্বন্ধে শুধু প্রশংসাই করতে পারি, পত্রিকাটির জন্যে কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট না। যাইহোক, এবার সভার প্রসঙ্গে, বা তার বিস্তর ফাঁক - ফোকরগুলির সম্বন্ধে আসা যাক। এখানে আমি ৩টি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা (পড়ুন সমালোচনা) করতে চাই।

(১) **প্রধান অতিথি** - সভার প্রধান অতিথি শ্রী অনিল সাউ তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই ব্যক্ত করেন যে উনি সমীক্ষণের সবকটি সংখ্যাই মনোযোগ সহকারে পড়েছেন। প্রসঙ্গত সমীক্ষণের তৃতীয় সংখ্যার "পরিবেশ ভাবনার স্বরূপ ও সমাধান" নামক নিবন্ধটির কথায় আসি। নিবন্ধটিতে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে কিভাবে পরিবেশ চিন্তাকে বাণিজ্যিক আকার দেওয়া হয়েছে - এবং এর দ্বারা মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা, ভ্রান্ত জ্ঞান নিবদ্ধ করে এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের বাণিজ্যিক কার্যসিদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই "বাণিজ্যিক পরিবেশ চিন্তা"র মধ্যে অন্যতম ছিল "কার্বন বাণিজ্য" [পয়েন্ট (ক)] এবং "গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন" [পয়েন্ট(গ)]। অদ্ভুত ভাবে সাউ মহাশয় বক্তৃতার শেষে বলেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং নাকি বর্তমান পরিবেশের পক্ষে একটি বড় সমস্যা এবং আমাদের সবাইকে এর সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। খুব কঠোরভাবে বললে "সাতকান্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার স্ত্রী" না জানার মত হল বক্তৃতার শেষ উক্তিগুলি। আরো দুঃখের (বা নিন্দুকের পক্ষে কৌতুকের) বিষয় এই যে, সমীক্ষণের চতুর্থ সংখ্যা, যার মূল নিবন্ধটিই হচ্ছে "গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি মানুষের সৃষ্টি ?" উদ্বোধন করেন অনিলবাবুই। এত বিপরীতধর্মী ঘটনাবলী অত্যন্ত দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক।

(২) তাৎক্ষনিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা - এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্থানাধিকারির (নাম ??) বক্তৃতার বিষয় ছিল "ভূমিকম্পের প্রভাব ও সমাধান"। এখানে বলে রাখা উচিত ভূমিকম্পের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সমীক্ষণের দ্বিতীয় সংখ্যার "ত্রিপুরায় ভূমিকম্প বিষয়ক সেমিনার" নামক রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ঐ প্রতিযোগী তো সেই রাস্তায় হাঁটা দূরের কথা, বিজ্ঞানগতভাবে ভুল ব্যাখ্যা ও সমাধানের রাস্তা বলেছেন। যেমন সমাধানের একটি রাস্তা ওনার মতে বৃক্ষ বপন করা। বৃক্ষ বপন করলে গাছের শিকড় মাটিকে আরো শক্ত করে ধরে রাখার ফলে ভূমিকম্প রদ করা সম্ভব, এটা ছিল ওনার যুক্তি, যা সম্পূর্ণভাবে ভুল। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক তিনি সমীক্ষণের ওই রিপোর্টটি পড়েননি। সেটা কোন শাস্তি যোগ্য অপরাধ না, কিন্তু এখানে বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে তাকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা উচিত ছিল। সে তো দূর অস্ত, মাননীয় বিচারকেরা কি করে ওনাকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারি ঘোষণা করলেন, এটা ব্যক্তিগতভাবে বোধগম্য হয়নি আমার কাছে। তার মানে ধরে নেওয়া যায় মাননীয় বিচারকেরা নিজেরাই যে বিষয়গুলি নিয়ে বিচারকের মতামত দেবেন, সেগুলির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আরো গুরুতর ব্যাপার হল এই ঘটনাটির দ্বারা উপস্থিত মানুষজনের কাছে একটি গুরুতর বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য সরবরাহ করা তো হলই এবং আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার, হল ঐ প্রতিযোগীর সেই ভুল তথ্য ও যুক্তিকে দ্বিতীয় স্থানের মর্যাদা দিয়ে সেগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। আমার মতে গোটা অনুষ্ঠানের সব থেকে কলঙ্কজনক ঘটনা এটিই।

(৩) রসায়নের মজা (Fun with Chemistry) - নাম শুনে যা মনে হচ্ছে সেটা খুব একটা পেলাম না। অনেক টেস্ট মঞ্চে ঠিকভাবে কাজ করল না। ছোটখাটো ত্রুটি, তাও মানা যায়, কিন্তু অধিকাংশ Experiment-এর সময়েই বড়সড় গন্ডগোল হল। এর সঙ্গে সঠিক উপকরণ না থাকা - যেমন Distilled water না থাকা, Concentrated Acid না থাকার ফলে অনেক টেস্টই অসফল হল। এটির বিষয়ে আগে থেকে আরো প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল। জরুরি ছিল আরো সাবধানতা। সঠিক উপকরণ ছাড়া কেন যে আক্ষরিক অর্থেই "রসায়ন নিয়ে মজা" করা হল, সেটা স্তম্ভিত করে দেওয়ার মত। বিজ্ঞান মনস্ক'তার এক ফোঁটাও ছাপ পেলাম না গোটা বিষয়টি নিয়ে।

"আন্তর্জাতিক রসায়ন বর্ষে" রসায়নশাস্ত্রকে স্মরণীয় কিছু উৎসর্গ করা তো গেলই না, বরং রসায়ন বিজ্ঞানের উর্ধ্বে গিয়ে রসায়নের ক্রিয়াকর্ম দেখানোর প্রচেষ্টার বেশ কড়া উত্তরই দিল রসায়ন। আমরা বিজ্ঞানের উর্ধ্বে যাইনি, সেটা আবার বুঝিয়ে দিল।

অনেক কথা বললাম, আমার প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু বিজ্ঞান মনস্ককে তুলোধনা করা না। আমি বিজ্ঞান মনস্ক'র শুভানুধ্যায়ী, এবং আমি আন্তরিকভাবেই চাই আপনাদের প্রচেষ্টাগুলি সফল হোক। এত সমালোচনার উদ্দেশ্য একটাই, সাধারণ দর্শক হয়ে আমার চোখে যে গাফিলতিগুলি ধরা পড়েছে সেগুলি আপনাদের ধরিয়ে দেওয়া। সমীক্ষণ দুর্দান্ত সৈনিক সন্দেহ নেই, কিন্তু বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিটা অনুষ্ঠান যদি সেই সৈনিককে যোগ্য সহায়তা না দিতে পারে, তাহলে যুদ্ধজয়ের ভাবনা স্রেফ দিবাস্বপ্ন। ৬ই নভেম্বর যে সকল দর্শক উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা সমীক্ষণ সত্যিই মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁদের কাছে যে বার্তাগুলি গেল, সেগুলি কিন্তু একেবারেই আকর্ষণীয় নয়।

বিজ্ঞান মনস্ক'র শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আশা করব আমার মত সাধারণ ব্যক্তির মতামতগুলি আপনারা গুরুত্ব সহকারে বিচার করবেন।

অভিনন্দন সহ,
সায়ম কোনার

প্রিয় বন্ধু সায়ম,

আপনার লিখিত পত্রের জন্য আপনাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আপনি নিজেকে বিজ্ঞান মনস্কে'র শুভানুধ্যায়ী হিসাবে মনে করেন তাই সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। প্রথমে বলি আপনি 'বিজ্ঞান মনস্ক'কে একটি "বৈজ্ঞানিক" সংগঠন হিসাবে অভিহিত করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে জানানো প্রয়োজন যে 'বিজ্ঞান মনস্ক'র মূল লক্ষ্য মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলা। এটা কোন তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের সংগঠন নয়। তবে, কোন বৈজ্ঞানিক 'বিজ্ঞান মনস্ক'র মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করলে তিনি বিজ্ঞান মনস্ক'র সৈনিক হতে পারেন।

এবার ৬ই নভেম্বর-এর অনুষ্ঠান সংক্রান্ত আপনার সমালোচনার প্রসঙ্গে আসি। ১) প্রধান অতিথি প্রসঙ্গে আপনার সমালোচনা মূলগতভাবে সঠিক হলেও মনে রাখবেন শ্রী যুক্ত অনিল বাবু আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি। তাঁর বক্তব্য সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে গেলেও তা নিতান্তই ওনার ব্যক্তিগত মতামত। সংগঠন তার মতামত অন্য কারুর উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। তবুও প্রধান অতিথি নির্বাচনে আমরা ভবিষ্যতে সজাগ থাকব।

২) আপনার দ্বিতীয় সমালোচনা অবশ্যই সঠিক। বিচারকরা সংগঠনের কেউ না হলেও তাঁদের ভুলের দায় সংগঠনকেই নিতে হবে।

৩) আপনার তৃতীয় সমালোচনাটি সংগঠন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে।

পরিশেষে বলা দরকার যে ৬ই নভেম্বরের অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচ্যসূচী "আন্তর্জাতিক রসায়ন বর্ষ ২০১১" সেমিনার নিয়ে আপনি কোন সমালোচনা বা মন্তব্য করেন নি। অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত নাটক 'মাদাম ক্যুরি' নিয়েও আপনি কিছু বলেন নি। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানালে বাধিত হব।

ধন্যবাদান্তে
সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ

দায়

অমরেন্দ্রনাথ বৈদ্য

দশ বছরের মেয়ে জীবনের গান গেয়ে,
পেটের জ্বালায় দরজী দোকানে কাজ নিলো সে চেয়ে ॥

বার ঘন্টার কাজ, মরশুমে আরো বেশি
কখনো কখনো ষোল ঘন্টা, একটানা চলে পেশী,
হারায় নি উদ্দাম, চলে পতাকার মতো বেয়ে
হারিয়েছে তার বাবা দিন কাটে না খেয়ে ॥

ঠাসাঠাসি ক'রে ব'সে খুপরী ঘরেতে কাজ
শত লাঞ্ছনা সয়ে, এ বয়সে ভাঙে লাজ
বাতাস আলোর অভাব অসহ্য ঘামে নেয়ে
তবু কাজ তার, অসহায় মা'র, ক্যানসার গেছে ছেয়ে ॥

শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও বিজ্ঞান (৩)

তত্ত্বীয় বিজ্ঞান – গ্রীক বিজ্ঞান

কোনো পরিবর্তন, বিক্রিয়া বা বিকাশ সর্বদা একই হারে, একই গতিতে চলে না – বিশেষ করে যখন তার উপর অনেক শর্ত ক্রিয়া করে। এই শর্তগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করি – অভ্যন্তরীণ শর্ত এবং বাহ্যিক শর্ত। বস্তুর পরিবর্তনের অভ্যন্তরীণ শর্ত তার ভিতরেই, তার উৎপত্তিগত কারণেই বিদ্যমান থাকে। যেমন ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি তাদের বিশেষ পারমাণবিক গঠনের জন্য নিরন্তর বিভাজিত ও রূপান্তরিত হতে থাকে। আবার চাপ,তাপ, উদ্দীপক প্রভৃতি বাহ্যিক শর্ত বিক্রিয়ার গতি এবং পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

মানব বিকাশ ও তার সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রেও আমরা তার বিচিত্র গতি ও বিভিন্ন পরিবর্তনের হার দেখেছি। এই গতি কখনো মন্থর, অতি মন্থর; কখনো দারুণ বেগবান, কখনো বিরাট উল্লম্ফন সহ সম্পূর্ণ নতুন এক দশায় উত্তরণ।

আদিম মানবের বিকাশের বাহ্যিক শর্ত হিসাবে কাজ করেছে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ, বস্তুজগৎ ও তার ঘটনাপ্রবাহ। আর অভ্যন্তরীণ শর্ত হিসাবে কাজ করেছে বিবর্তনের পথ ধরে অর্জিত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, উদ্ভাবনী শক্তি। সমাজ বিকাশের এক স্তরে এসে যখন সামাজিক শৃঙ্খলা, নিয়ম-নীতি এবং শাসনকার্যের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীপতির পরিবর্তে রাজতন্ত্র কায়েম হল, সমাজের বাহ্যিক শর্ত তখন বদলে গেল; উৎপন্ন হল মূলতঃ দুটি শ্রেণী ১) রাজন্যবর্গ, পুরোহিত ও শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্গত উচ্চশ্রেণী এবং ২) কৃষি শ্রমিক, কর্মকার, সাধারণ দিন মজুর মিলে নিম্ন শ্রেণী। এবং উদ্বৃত্ত সম্পদের কর্তৃত্ব প্রথম শ্রেণীর হাতে পড়লো। এই শ্রেণী বিভাজন তৎকালীন পরিস্থিতিতে উৎপাদন ও সামাজিক বিকাশকে সাহায্য করেছে। কিন্তু জন্ম দিয়েছে এক নতুন দ্বন্দ্বের, তাহ'ল – শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব। দাসত্ব বৃত্তিতে বাধ্য মজুর, কৃষক, কারিগরেরা নতুন নতুন ব্যবহারিক আবিষ্কারের তাগিদ ও প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলল। কাজের স্বাধীনতা হারিয়ে নিঃস্ব দাসেরা শাসকশ্রেণীর কাছে আত্মবিক্রয়ে বাধ্য হয়েছিল। এদেরই ঘাম-রক্তে তৈরী মিশরের পিরামিড, মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় ধনিকদের বাসস্থানের পাশে এদেরই কুঁড়ে ঘরের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় রাজন্যবর্গের পরেই ছিল পুরোহিতদের স্থান। শ্রেণী শোষণের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কুশলী প্রয়োগ মানুষকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, যাদুবিদ্যায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং ফলিত বিজ্ঞানের গতি ব্যহত করেছে।

বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত, তার সৃষ্টি লগ্ন থেকে উৎপাদনমুখী এবং উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে চলে। উৎপাদনের উপায় উপকরণ পরিবর্তিত ও উন্নততর হয়। এর সঙ্গে উৎপাদনের চরিত্র ও উদ্দেশ্য তাল না মেলাতে পারলে সামাজিক বিকাশ রুদ্ধ হয়। গড় আয়ু বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগর সভ্যতার উন্মেষ – এসব কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞানের ব্যাপক ও সচেতন ব্যবহার না করায় দাসনির্ভর মিশর, মেসোপটেমিয়া ও ব্যবিলনের সমাজ আর বিকশিত না হয়ে স্থবিরতা প্রাপ্ত হল। প্রকৃতির গবেষণাগারে অর্জিত বিজ্ঞানের প্রাচীন অঙ্কুরগুলি আর বৃক্ষ হয়ে উঠলো না এই সভ্যতাগুলিতে।

সমাজ ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে বিজ্ঞানের ভূমিকা কতটা? আমরা দেখেছি, বিজ্ঞানের প্রয়োগ উৎপাদনকে বিকশিত করেছে এবং পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটিয়েছে; উৎপাদনের উপায় উপকরণকে শক্তিশালী করেছে; মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি করেছে, জনসংখ্যা বাড়িয়েছে এবং অসংখ্য মানুষকে নির্দিষ্ট কাজ ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে একত্রিত করেছে। বিজ্ঞানের প্রয়োগ এই পরিবর্তন ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মালিকানা এবং উৎপাদিত সামগ্রির বন্টনে অসাম্য লক্ষ্য করা গেছে, ফলে সমাজে শ্রেণী দ্বন্দ্ব জন্ম নিয়েছে এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্য ও চরিত্র বদলেছে।

উৎপাদনের বিকাশের সাথে সমাজের বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর সঙ্গে আর একটি অতি অবশ্য শর্ত হল মানবশক্তির বিকাশ, যে শক্তি যন্ত্র বানায় এবং মাঠে

ঘাটে, উৎপাদন ক্ষেত্রে যন্ত্র হাতে উৎপাদন করে।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদরো, ব্যাবিলন, সুমের, মেসোপটেমিয়া ও মিশরের নগর সভ্যতাও শ্রেণী বিভক্ত সমাজের প্রতিফলন। এই সভ্যতাগুলি অবলুপ্তির শিকার হয়। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে 'লিপি', তারও ব্যবহার মুষ্টিমেয় লিপিকার গোষ্ঠীর হাতে ছিল, যারা রাজ্য শাসনকার্যে ও রাজপ্রশস্তি রচনায় এবং রাজ-কাহিনী রচনায় নিযুক্ত ছিল। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষ্যে মানুষ যে ধর্মচর্চার সূচনা করেছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতে সেই ধর্মই 'প্রাতিষ্ঠানিক' রূপ লাভ করে এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার, সৃজনশীলতা বিমুখ বাতাবরণে বেধে রাখে। বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও স্বাধীন বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হল। মানবশক্তির হাত ধরে জন্ম নেওয়া কারিগরি বিদ্যা তার মর্যাদা হারাল।

বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ইতিহাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর গতি যতই মন্দীভূত এবং প্রায় বিলীন মনে হোক না কেন, অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা কখনো হারিয়ে যায় নি। তাই ব্যাবিলন, মিশর মেসোপটেমিয়া, হরপ্পা-মহেঞ্জোদরোর বিকাশ রূদ্ধ হলেও ভারতবর্ষ ও মহাচীনে বিজ্ঞানের চর্চা, দুর্বলভাবে হলেও গতিশীল ছিল এবং খ্রী. পূ. সপ্তম শতাব্দী থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও মধ্যপ্রাচ্যে গ্রীক জাতির বিকাশ সভ্যতা ও বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হরপ্পা-মহেঞ্জোদরোর অতি বিকশিত নগর সভ্যতা কেন ধ্বংস হল তা এখনও অনাবিষ্কৃত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই হয়ত এই ধ্বংসের কারণ।

যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে ভারতবর্ষ, মহাচীন, ব্যবিলন, মিশরে বিজ্ঞানের প্রকাশ দেখা গেছে, গ্রীস সেই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ারই অঙ্গ, হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠে নি। গ্রীক বিজ্ঞান আরও বিকাশ লাভ করেছে এবং গ্রীকদের গবেষণা আরও বিশ্লেষণধর্মী ও সুশৃঙ্খল হয়েছে।

আমরা আগে আলোচনা করেছি যে বিজ্ঞানের দুটি দিক আছে – তত্ত্বগত এবং প্রয়োগগত। বিজ্ঞানের শৈশবকালে প্রকৃতিকে জীবনের অনুকূলে আনার জন্য এবং আত্মরক্ষা ও জীবনধারণের ন্যূনতম সম্পদ আহরণের জন্য প্রয়োগই মূল বিষয় ছিল। গ্রীকদের সময়ে **তত্ত্বগত বিজ্ঞান** আত্মপ্রকাশ করে, যা বলা যেতে পারে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ। এই গ্রীক বিজ্ঞান ছিল অনেক পরিশীলিত বিশেষীকৃত। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, সেগুলির ব্যখ্যা ও নিয়ম আবিষ্কার গ্রীক বিজ্ঞানে প্রতিফলিত।

থালেস, অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার, অ্যানাক্সিমেনেস, পিথাগোরাস – এঁরা গ্রীসে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের মণীষী এবং এঁদের হাত ধরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা, তত্ত্ব, গাণিতিক তত্ত্ব, জ্যামিতি, পরিমাপ পদ্ধতি সুশৃঙ্খল আকার লাভ করে। পর্যবেক্ষণের পরের ধাপ মননশীলতার বিশেষত্বই এই দার্শনিকদের কৃতিত্ব। কখনো কখনো তাঁদের মতবাদ বা চিন্তাধারা প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিরোধী হওয়ায় তাঁদের উপর শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার নেমে এসেছে। তবুও এইভাবেই বিজ্ঞান তার তত্ত্বীয় দৃঢ়তা লাভ করেছে এবং বিকশিত হয়েছে।

এবার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, চিন্তাধারার ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের মণীষার সাথে পরিচয় করি ঃ–

থালেস (খ্রী. পূ. ৬২৪-৫৪৭) – গ্রীক বিজ্ঞানের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন থালেস। তিনিই প্রথম এই ধারণা প্রচার করেন যে প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনার পিছনেই নিয়ম ও শৃঙ্খলা বর্তমান এবং প্রকৃতির সব রহস্যেরই ব্যাখ্যা বা সমাধান সম্ভব। সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থালেসের ছিল। জ্যামিতিতে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। থালেস ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি প্রাকৃতিক নিয়মে হয়েছে বলে মনে করতেন। তাঁর মতে জলই বিশ্ব-সৃষ্টির মৌলিক উপাদান।

অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার (খ্রী. পূ. ৬১০-৫৪৫) – অ্যানাক্সিম্যাণ্ডারই প্রথম সমগ্র পৃথিবীর এক সম্পূর্ণ মানচিত্র আঁকেন। তিনি মনে করতেন, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত; জ্যোতিষ্কগুলি ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দিকে আবর্তিত হচ্ছে, পৃথিবীর আকৃতি চ্যাপটা নিরেট চোঙের মত এবং তা আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে মহাসমুদ্র। অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও ধারণা 'অ্যাবাউট নেচার' নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন।

অ্যানাক্সিমেনেস (খ্রী. পূ. ৫৮৫-৫২৮) – অ্যানাক্সিমেনেসের মতে ব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান জল নয়, বায়ু। বায়ু থেকেই জল ও মৃত্তিকার উৎপত্তি। তাঁর জ্যোতিষ তত্ত্ব হল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র বায়ু-সমুদ্রে ভাসমান। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রেরা এক একটি আগুনের চাকতি, সূর্য হল পাতলা ও চ্যাপ্টা। তাঁর মতে, নক্ষত্ররা স্ফটিক স্বচ্ছ। অপেক্ষাকৃত কাছে থাকার জন্য সূর্যের তাপ আমরা অনুভব করি, দূরত্বের জন্য নক্ষত্রের তাপ অনুভব করি না।

পিথাগোরাস (৫৭২-৪৯৭) – পিথাগোরাস তাঁর গবেষণার ফল ও মতবাদ লিপিবদ্ধ করে যান নি। বিজ্ঞান, দর্শন সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ ও গবেষণা পিথাগোরীয় শিষ্যদের মুখে মুখে আলোচিত ও গতিশীল ছিল। পিথাগোরাস এক গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সমস্ত গবেষণা এই সঙ্ঘের নামে

হ'ত যা 'পিথাগোরীয়েরা' – এই নামে উল্লেখ করা হয়। গবেষণা ও মতবাদ লিখে প্রকাশ করা পিথাগোরীয়ানদের কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল।

পিথাগোরীয়েরা সংখ্যাকে বস্তু-নিরপেক্ষ মনে করতেন না। সংখ্যা কাল্পনিক বা অমূর্ত নয়, বস্তুজগতের সাথে সংখ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সঙ্গীতের সপ্তক উদারা, মুদারা, তারার সঙ্গে পিথাগোরীয়ানরা সংখ্যার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনায় পিথাগোরীয়ানদের অনেক অবদান আছে। পৃথিবী ও জ্যোতিষ্কগুলির গোলাকৃতির ধারণা গ্রীক বিজ্ঞানীদের মধ্যে পিথাগোরীয়ানরাই প্রথম উপলব্ধি করেন।

পিথাগোরীয়ান দর্শনের প্রচারক ফিলোলাউস নিজেও একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা সম্পর্কে যা জানা যায় তা হল, ব্রহ্মাণ্ড আকৃতিতে গোলাকার এবং সসীম। এর সীমানার বাইরে অসীম শূণ্যতা। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে আছে এক বিশাল অগ্নিকুন্ড। এটিই শক্তির উৎস। কেন্দ্রীয় অগ্নিকে সবচেয়ে কাছের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে 'বিপরীত পৃথিবী'। পরবর্তী বিভিন্ন কক্ষপথে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, পাঁচটি গ্রহ ও স্থির নক্ষত্রেরা নিয়মিত প্রদক্ষিণ করে। ফিলোলাউস দিন রাত্রির ব্যাখ্যা দেন এবং কেন্দ্রকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহদের কত সময় লাগে, তিনি তাও গণনা করেন।

অ্যানাক্সাগোরাস্ (খ্রী. পূ. ৫০০-৪২৮) – গ্রীক বিজ্ঞানীদের অন্যতম অ্যানাক্সাগোরাসের খ্যাতি মূলতঃ চন্দ্রগ্রহণ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এথেন্সবাসীরা তাঁর মতবাদকে ধর্মবিরুদ্ধ বলে, তাঁকে বন্দী করে এবং পরে এথেন্স থেকে নির্বাসিত করে। এর কিছু পরে এথেন্সবাসীরা সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। অ্যানাক্সাগোরাস ব্রহ্মাণ্ডে একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্বের কথা বলেন। সেই সব পৃথিবীর নিজস্ব চন্দ্র, সূর্য, জ্যোতিষ্করা আছে, সেখানেও মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ বর্তমান।

লিউসিপপাস ও ডিমোক্রিটাস গ্রীক **আণবিক তত্ত্বের** জন্মদাতা। এই তত্ত্বের মূল কথা হল, জড়জগৎ অতিক্ষুদ্র, অপরিবর্তনশীল, অসংখ্য পরমাণু দ্বারা গঠিত। এই পরমাণুদের উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। আকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও প্রত্যেক পরমাণুর প্রকৃতি ও গঠন এক। বাহ্যিক ধর্মের যে পার্থক্য তা হল পরমাণুর আকৃতি, আয়তন, গতির জন্য। কঠিন বস্তুতে পরমাণুগুলি স্পন্দিত হয়েই চলে, কিন্তু বায়ু বা অগ্নির মধ্যে পরমাণুরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে প্রতিক্ষিপ্ত হয়। সৃষ্টি হয় নানা জটিল গতি ও আবর্তের। সমগুণ সম্পন্ন পরমাণুরা মিলিত হয়ে মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করে। এইভাবে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে বিভিন্ন বস্তু এবং অবশেষে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে ব্রহ্মাণ্ডের বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ আছে। যে সব ব্রহ্মাণ্ড পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে, তারাই টিকে থাকে। লিউসিপ্পাসের মতে, বিনা কারণে কিছুই ঘটেনা, যা কিছু ঘটে তার পিছনে কারণ ও প্রয়োজন থাকে।

বস্তুর এই পরমাণুবাদ অল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের তীব্র বিরোধীতায় এই মতবাদ তখনকার মত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

এতক্ষণ ধরে, এত কিছু বৃত্তান্ত শোনাবার উদ্দেশ্য হল এই যে, পরীক্ষা ভিত্তিক প্রমাণ ছাড়া, শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ এবং তৎযুগোপলব্ধ গণনাকে হাতিয়ার করে মানব মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসন্ধার করে গেছে, মননশীলতার পরিচয় রেখেছে এবং অনেকক্ষেত্রে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেছে। তত্ত্বীয় বিজ্ঞান ভাবনার অফুরন্ত সম্ভাবনা ও জ্ঞান অর্জনের আনন্দের পথ রচনা করে গেছে, এবং বিজ্ঞানকে যোগ করেছে মানবিক দর্শনের সাথে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রাচীন কতকগুলি সভ্যতায় যেমন ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতবর্ষে এবং মহাচীনে চিকিৎসাশাস্ত্রের, এমনকি শল্য চিকিৎসারও দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। অন্যান্য সভ্য পূর্বসূরিদের কাছ থেকে তারা তা অর্জন করে। কিন্তু গ্রীকদের সময় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র সামাজিক আদর্শবোধের ধারণা পায়। গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবাদ পুরুষ **হিপোক্রেটিসের** নামে যে 'হিপোক্রেটীয় শপথ' উচ্চরিত হত, তা সেই আদর্শের প্রমাণ। পরীক্ষিত সত্যের উপর গ্রীক চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দিতেন। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা – এই ছিল হিপোক্রেটিসের চিকিৎসা পদ্ধতির মূল।

থালেস থেকে শুরু করে হিপোক্রেটিয়ানদের চিকিৎসা গবেষণাকাল – এই দু'শ বছর গ্রীক বিজ্ঞান-চর্চার গৌরবময় অধ্যায়। এরপর সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের সময় গ্রীসের বস্তুবাদী দর্শন পিছু হটল, আধ্যাত্মবাদী দর্শন প্রচারে এল। থালেস, লিউসিপ্পাস, ডিমোক্রিটাস, পিথাগোরিয়ান বা হিপোক্রেটিয়ানরা কারিগরি শিল্পের মূল্য দিতেন। প্লেটো কারিগরি বিদ্যাকে অবজ্ঞা করতেন। সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তাধারা, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও সিদ্ধান্তের যে বিজ্ঞান চিন্তা গ্রীকরা শুরু করেছিল, আধ্যাত্মবাদী দর্শন তার বিরোধিতা করল। সক্রেটিস ও প্লেটো প্রচার করলেন, জ্ঞানে উৎস মননশক্তি ও চিন্তাশক্তি। এই শক্তি দ্বারাই মানুষের ও বস্তুজগতের সর্বপ্রকার সমস্যা ও রহস্যের সমাধান সম্ভব।

বস্তুবাদী, আণবিক তত্ত্বের প্রবক্তা ডিমোক্রিটাস বলতেন, "প্রচলিত অভিজ্ঞতায় আমরা মিষ্টিও পাই, তেতোও পাই; উষ্ণ পাই, শীতলও পাই এবং প্রচলিত অভিজ্ঞতায় রঙ দেখতে পাই। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, সত্য শুধু পরমাণু এবং শূণ্যতা।"

[According to convention there is a sweet and a bitter, a hot and a cold, and according to convention there is colour. In truth there are atoms and a void.]

আধ্যাত্মবাদের প্রচারক প্লেটো বলেন, বস্তুজগৎ প্রাকৃতিক নিয়মে চলে না, তা আসলে এক অদৃশ্য, অলৌকিক, অশরীরী শক্তির দ্বারা চালিত হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য বা পর্যবেক্ষণ প্রকৃত সত্য নয়, প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে হলে সমস্ত প্রকার দেহানুভূতির উর্ধ্বে উঠে আত্মার ঐশ্বরিক অন্তদৃষ্টিবলে কোনও জিনিস সম্বন্ধে চরম ও সম্যক জ্ঞানলাভ সম্ভব। জ্যামিতি, গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ ছাড়া সার্বিক বিজ্ঞান গবেষণার বিরুদ্ধে ছিলেন প্লেটো।

আদিম মানব বস্তুজগৎ সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকতে পারে নি, তাই তার হাত ধরে সভ্যতার সূর্যোদয় ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে। 'আত্মা' নামক বিষয় নিয়ে ভাববার অবকাশ ও প্রয়োজন তার ছিল না, কারিগরি ক্ষমতা ও তার সাহায্যে জীবনযাত্রাকে সহজ করা তার কাজ ছিল। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তার কাছে ছিল না, এই অজ্ঞতা থেকে তার মধ্যে হয়তো 'ভয়' কাজ করতো, কিন্তু কোনো সর্বশক্তিমান 'ঈশ্বর'-এর তত্ত্ব সে উদ্ভাবন করে নি। এই আধ্যাত্ম ও ঈশ্বরবাদী দর্শন শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বিশেষ 'প্রয়োজনে', প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম প্রচারকদের উদ্যোগে জন্ম নিয়েছে এবং সম্পদ ও রাজ্যের মালিকানা রক্ষার জন্য শ্রেণীস্বার্থে এই দর্শনের প্রয়োগ হয়েছে।

বস্তুগত এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে, চেতনা ও শ্রম দ্বারা ধারাবাহিকভাবে যে মানসিক বিকাশ অর্জিত হয়েছে, সেই ফসলের হাত ধরেই অন্য পথের দিকে হাঁটা দিল আধ্যাত্মবাদ। অর্থাৎ আধ্যাত্মবাদ ও ঈশ্বর-তত্ত্ব বিজ্ঞানের ও মানব বিকাশের একটা স্তর পর্যন্ত না এলে "তাত্ত্বিক" রূপ পেত না। তাদের মতে, ঈশ্বরের কৃপায় ও অনুগ্রহেই উন্নয়ন ও আবিষ্কারগুলি সম্ভবপর হয়। প্লেটোর মত অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া ধর্মবিরুদ্ধ এবং হীন, তা কারিগর বা মজুর প্রকৃতির নিম্নশ্রেণীর লোকেদের পথ।

প্লেটো, সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকের এই বিজ্ঞান বিরোধীতা ও আধ্যাত্মবাদ প্রচারের কারণ কি? বিজ্ঞান তো তিল তিল করে সভ্যতার উপকরণ, উৎপাদন, চিকিৎসা দ্বারা রোগমুক্তি প্রভৃতি সকল আয়োজনই করেছে এবং এক ক্রম উন্নতির পথ দেখিয়েছে! তাহলে প্লেটোর মত অসাধারণ প্রতিভা বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার বিরোধিতা করলেন কেন? আসলে, বুদ্ধিজীবী ও প্রতিভাধরদের বুদ্ধি থাকাটাই যথেষ্ট নয়, তাঁরা কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রীক বিজ্ঞানের বিকাশের পর্য্যায়ে যান্ত্রিক আবিষ্কারকদের মর্যাদা ছিল। তখন শ্রমের মর্যাদা ছিল। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যে বণিকশ্রেণী ছিল তারা শ্রম-মর্যাদা আদর্শের প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। গ্রীক শব্দ সোফিয়া (Sophia) বা জ্ঞানের অর্থ ছিল শিল্প ও যন্ত্র সম্পর্কিত দক্ষতা। থিওডোরাস (খ্রী. পূ. ৫৩২) লেদ্, চাবি, সমতলদর্শক যন্ত্র, স্কেল, রুল, পিতল ঢালাই-এর উন্নততর পদ্ধতি, নানাপ্রকার যন্ত্র ও শিল্প পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। থালেসের জ্যামিতিক ও গাণিতিক গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ চলাচলকে সুগম করা। নাবিকদের সুবিধার জন্য অ্যানাক্সিম্যান্ডার পৃথিবীর মানচিত্র রচনা করেছিলেন।

কিন্তু প্লেটোর সময়ে গ্রীক সমাজ জীবনে, "দাস প্রথা" কায়েম হয়, অ্যারিস্টটল দাস প্রথাকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেন। ক্রীতদাসদের উপরে কৃষিকার্য, কারিগরি ও শিল্প সম্বন্ধীয় কাজ চাপিয়ে সম্পন্ন গ্রীক সমাজ কায়িক পরিশ্রমের কাজ থেকে অব্যহতি পেল। দাসদের পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা স্বাচ্ছন্দ্য পেতে থাকলো। ক্রীতদাস-শ্রেণী থেকে শাসকশ্রেণী সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হল, দাসদের শ্রমে পুষ্ট অবসরভোগী নাগরিকেরা শাসনকার্য পরিচালনা ও দর্শনচর্চায় নিযুক্ত হল। প্লেটো, সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল এই শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। (চলবে)

প্রকাশিত হচ্ছে এম পি থ্রি সিডি

সঙ্গীতে সলিলী শৈলী

বিজ্ঞান মনস্ক'র একটি প্রয়াস

৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে অনুষ্ঠান স্থল ও বিভিন্ন স্টলে পাওয়া যাবে।
সহযোগিতা রাশি ঃ ৫০ টাকা

গল্প

রামধনুর খোঁজে

–অন্যরূপ

(শেষাংশ)

(৩)

নিতাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। গলুর মা আবার জিজ্ঞাসা করে, "কি হয়েছে নিতাই ?"

নিতাই বিড়বিড় করে, "ওরা ফিরে এসেছে।"

"ফিরে এসেছে ? কারা ? রফিক আকবর আর ফজলুল ?"

গলু চেঁচিঁয়ে উঠে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে খাওয়া ফেলে গলু কোন মতে হাতটা ধুয়ে সাঁ করে নিতাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। মা বারণ করবারও অবকাশ পায়না।

বাড়ীর বাইরে এসেই গলু আকবরদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে দৌড়তে লাগল। নিতাই পিছন থেকে চেঁচাচ্ছে "দাঁড়া দাঁড়া গলু ওদের বাড়ীতে এখন যাসনি।"

"কেন ?" দাঁড়িয়ে পড়ে গলু।

"ওদের এখন খ্যাঁটন চলছে।"

"তার মানে ?"

"বুঝলিনা ? কাল থেকে বাড়ী নেই। এখন আগে মার খাবে তারপর কথা।"

"ও" গলু খুব হতাশ হয়ে পড়ে। ওর মনের মধ্যে গজগজ করছে হাজার প্রশ্ন। এদিকে মা কিছু বলতে বারণ করেছে।

"কিন্তু ওরা এল কখন ?"

"এই তো একটু আগে।"

"তুই কি করে জানলি ?

"বারে আমি তো দেখলুম ওরা ওদের বড় আম্মির সঙ্গে আসছে।"

"বড় আম্মি ? মানে আজব ভাইয়ের মা ?"

"হ্যাঁ রে। বুড়ী সেই ভোর থেকে স্টেশনে বসেছিল। ওদের দেখে আমি কথা বলতে গেছিলাম। বুড়ী তো কাছে ঘেঁসতেই দিল না। দেখেই তাড়া করল। আকবররাও কোনও রা কাটল না। কি যেন হয়েছে ওদের। চুপচাপ বড় আম্মির সঙ্গে চলে গেল।

"তুই স্টেশনে গেছিলি কেন ?"

"স্টেশনের কাছে অবনী মাল্লিকের চায়ের দোকান আছেনা – ও আমাকে খুব ডাকে। একটু আধটু কাজ করিয়ে পয়সাও দেয়। আমাকে বরাবরের মত কাজ করতে বলে।"

গলু খুব সন্দিগ্ধ হয়, "তাহলে কি তুই আর কারখানায় যাবিনা ? ওখানে কাজ করবি ?"

"দূর" নিতাই কথাটা উড়িয়ে দিলেও তেমন জোর ফুটল না গলায়।

গলু বলে, "তুই জানিস লোকটা কিরকম পাজী ? এখন হাসছে পরে তোকে মারবে।"

নিতাই এবার গলায় জোর দিয়ে বলে, "কে বলেছে ? ও আমাকে খুব ভালবাসে। আমার দিদিকেও ভালভাসে। মাঝে মাঝে বিস্কুট দেয়, দিদির জন্যও দেয়।"

গলু এবার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে।

গলাটা কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়, "নিতাই তোর মনে নেই, একটা ছেলে ওর কাছে কাজ করত। কথা শোনেনি বলে গায়ে গরম জল ঢেলে দিয়েছিল। তারপর ছেলেটা পালিয়ে গিয়েছিল। কত পুলিশ এসেছিল মনে আছে ? আমরা তখন সকালবেলা কারখানায় যাচ্ছিলাম ?"

নিতাই এবার একটা ফ্যাকাশে হাসি হাসে।

"গলু আমার আর কারখানায় যেতে ভাল লাগেনা। ইস্কুলে যেতে পাইনা, পাড়ার কারও সঙ্গে খেলতে পাইনা। সক্কালবেলা গিয়ে সেই রাত্তির বেলা ফেরা – সারাদিন শুধু বোতল ধোও, লেবেল তোল আর লেবেল লাগাও।"

গলু চুপ করে থাকে - এ যে তারও মনের কথা। গলুর কাজটা আরও খারাপ। চামড়া ধোও, মেলো আর ভাঁজ করো। সারাদিন, সারাদিন। প্রথম প্রথম গন্ধে ওর বমি পেত।

এতসব সাত পাঁচ বকতে বকতে ওরা ঘোষেদের পুকুর পাড়ে এসে বসেছিল। অবসরে এটাই ওদের গল্প করার জায়গা।

নিতাই ওর মনটা বুঝতে পারে, বলে, "খাওয়া ফেলে তো চলে এলি। আমার বাড়ী চল দিদি পান্না করেছে। বাবা কোত্থেকে একটা সীতে হার মাছ এনেছে। দিদি ভেজেছে। চল।"

গলু যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে–

মা, ভাই-বোনদের ফেলে ও সীতে মাছ খাবেনা। কিন্তু নিতাইকে সে কথা বলেনা।" আমার খাওয়া হয়েই গেছিল। তুই খেয়ে আয়। আমি স্টেশনের ওই মেলার কাছে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি আসবি।"

গলু হাঁটতে থাকে স্টেশনের দিকে, তার চিরপরিচিত রাস্তা দিয়ে। বাবার না থাকাটা হঠাৎ ওর মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

আনমনা গলু পিছনে নিজের নাম শুনে হক্‌চকিয়ে তাকায়। নিতাই ডাকছে - কেন ?

দৌড়ে এসে নিতাই বলে, "তোকে তো একটা কথা বলাই হয়নি। সকালে সাধন স্যারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলেছে আবার আমরা স্কুলে যেতে পারব। অন্যরকম একটা স্কুল হবে – যেখানে কাজও করতে হবে পড়াও হবে। যা তুই আমি আসছি।" ঝড়ের মত এসে আবার ঝড়ের মত চলে গেল নিতাই।

সাধন স্যার - ওই স্যারটা যেন কেমন একটু অন্যরকম ছিল। গলুদের এলাকার মানুষই না - অন্য জেলার। ইস্কুলের চাকরীর সুবাদে এই গ্রামে থাকে। গলু যখন ক্লাস টু-এর শেষের দিকে তখন উনি আসেন। সাধন স্যার নাকি নিজের গ্রামের সবাইকে ভূত-প্রেত-মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাস ছাড়িয়ে দিয়েছেন। একটা মেয়েকে নাকি ডাইনী অপবাদ দিয়ে অত্যাচার করেছিল উনি এবং ওনার বন্ধুরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটাকে বাঁচান। সাপে কাটলে হাসপাতালে পাঠান। এখানে এসেও তাই করেন। আরও মাস্টার মশাই আর পাড়ার ছেলেরা মিলে সমিতি বানিয়েছে। আজব ভাই খুব মানত সাধন স্যারকে। কে বলবে গ্রামের মানুষই না একদম আপনার হয়ে গেছে। মনে আছে গলুর - যখন ফাইভে উঠল - আর স্কুলে যাবেনা - কারখানায় যাবার তোড়জোড় চলছে - একদিন সাধন স্যার এসেছিল ওদের বাড়ী। মার সাথে অনেক কথা বলেছিল।

মা বলেছিল, "মাস্টার মশাই কি করব ? তিনটে বাচ্চা নিয়ে খেয়ে পড়ে তো বাঁচতে হবে।"

"নীলকান্তর বাবাকে আপনি গিয়ে ধরেন না কেন ? তার তো খরচপত্র দেওয়া উচিত ?"

"তাকে আমি দোষ দিইনা মাস্টারমশাই। সেও তো তেমন লেখাপড়া শেখেনি। জন মজুরী করে যা পেত তাতে কুলোত না। তারপর বাচ্চা-কাচ্চা, অভাব-অভিযোগ – মাথা ঠিক রাখতে পারেনি তাই চলে গেছে। পালিয়ে গিয়ে যদি কোথাও সুখ পায় তো পাক। কিন্তু আমি জানি সেও পাবে না।"

"আপনি তো অদ্ভুত মানুষ। এরকম কথা কারও কাছে আমি শুনিনি। তা সে যাইহোক ছেলেকে তো মজুরী খাটতে পাঠাতে হচ্ছে ?

"তা হচ্ছে। সময় সুযোগ হলে ঠিক আবার পড়াশুনায় ভর্তি করে দেব।"

"আপনি বলছেন ঠিকই, কিন্তু পেরে উঠবেন না। এই ঘুণধরা সমাজ মানুষকে শুধু নীচের দিকেই টেনে নামায়। প্রতিবছর সারাদেশে কত ছেলেমেয়ে স্কুলছুট হয় জানেন? সবাই গিয়ে অল্প পয়সায় মজুরী খাটছে। ওদের শ্রমের উপর দাঁড়িয়ে কতজন ইমারত তুলছে।"

মা কেঁদে ফেলে।" মাস্টারমশাই আমার আর কোন উপায় নেই যে ?"

"সেতো জানি দিদি। আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিছু মনে করবেন না। আসলে স্কুলে ঢোকা থেকে দেখছি ছেলেমেয়েরা ক্রমাগত স্কুল ছেড়ে মজুরী খাটতে যাচ্ছে। আমি সবার বাড়ীতেই যাচ্ছি। এটাতো আটকাতেই হবে।"

"কি করে আটকাবেন মাস্টারমশাই। যাদের ঘর থেকে কারখানায় যাচ্ছে তাদের সবারই প্রায় আমার মত দশা।"

"আপনাদেরই সাহায্য করতে হবে। বাবা-মার সহযোগিতা ছাড়া শুধু আমরা কয়েকটা মানুষ মিলে চেষ্টা করলে কি হবে ?"

মা যেন একটু বল পায়, "আমাদের কি করতে হবে মাস্টার মশাই ?"

মাস্টার মশাই যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ে, "সারা দেশে না হোক আপনার চারপাশে আস-পাশে একটু খোঁজ নেবেন। দেখবেন আপনার মত মানুষের সংখ্যাই বেশি। সারা পৃথিবীতে বঞ্চনার শিকার যারা হচ্ছে তারাই সংখ্যায় অগুন্তি। তবে তারা পড়ে পড়ে মার খায় কেন ? কেন কিছু বলেনা ? অধিকার লড়ে নেয় না কেন ?" এর উত্তরে মা বাক্যহারা হয়ে যায়। কি বলবে ভেবে পায়না। মাস্টার মশাইয়ের কথাই যদি সত্য হয় তবে ...

সাধন স্যার হঠাৎ সচেতন হন, "আবারও বলছি আপনারা শক্ত হোন। কিছু করুন। আচ্ছা আজ আসি।"

হঠাৎই চলে যান। মা অনেকক্ষণ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। গলু মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

কি যেন ছিল সাধন স্যারের কথার মধ্যে,মা আর ছেলে আচ্ছন্ন হয়ে ঘরে এসে বসল। অনেকক্ষণ পরে মা-ই গলুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মাস্টার মশাই কি করতে বলল রে ?"

গলুর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল "লড়াই করতে বলল"।

"লড়াই ? কার সঙ্গে ?" আবার বলল নিজের মনেই, "লড়াই তো করছি, নিজেদের খাওয়া-পড়া জোগাড়ের লড়াই!"

.....

ভাবতে ভাবতে গলু কখন বড়ো রাস্তায় এসে পড়েছিল। গোধূলীর আলো মেখে স্বপ্নের ঘোরে সে হাঁটছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল পড়ন্ত বিকলে বাঁকা রামধনু। পশ্চিম আকাশে তার দিকে চেয়ে যেন হাসছে। মা তাকে অনেক দিন এই রামধনুর কথা বলেছিল।

"রামধনু রামধনু"

আবেগে উচ্ছ্বাসে হঠাৎ সামনে দিকে হাত বাড়িয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। প্রচন্ড গতিতে পিছনে আসতে থাকা ট্রাক টার শব্দ ওর কানে পৌছলো না। ট্রাক টা ওর ডান পাটা পিষে দিয়ে চলে গেল। রাস্তার পাশের ঝোপের মধ্যে ছিটকে পড়ে গলু।

"রামধনু - ইস্কুলে যাব", বলতে বলতে সে বেহুঁশ হয়ে যায়।■

ধারাবাহিক

মানুষের বংশগত রোগ, প্রতিকার ও চিকিৎসা

পঞ্চানন মন্ডল

সেক্স লিংকড বংশগতি – সেক্স ক্রোমোজোমের মিউটেশনের ফলে বিভিন্ন প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। 'Y' ক্রোমোজোমে তুলনা মূলক কম জিন থাকে ও এইসব জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য কেবল পুরুষদের দেখা যায়। 'X' ক্রোমোজোমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন মিউটেশন হতে পারে। মহিলাদের প্রতিটি দেহকোষে দুটি 'X' ক্রোমোজোম থাকায় মিউট্যান্ট জিনটি হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকে। কিন্তু পুরুষদের প্রতিটি দেহকোষে কেবল একটি 'X' ক্রোমোজোম থাকায়, 'X' ক্রোমোজোমে মিউট্যান্ট জিন প্রচ্ছন্ন বা প্রকট যে কোন অবস্থায় প্রকাশ পায়। 'X' ক্রোমোজোমের প্রচ্ছন্ন জিন হেটারোজাইগাস অবস্থায় (X*X) প্রকাশ পায় না, তাই এরা রোগের বাহক হয়, মহিলাদের প্রচ্ছন্ন জিন মিউটেশন কেবলমাত্র হোমোজাইগাস অবস্থায় (X*X*) প্রকাশ পায় যা অতি বিরল।

'X' ক্রোমোজোমের উত্তরাধিকার পিতা থেকে পুত্রে হয় না, পিতার 'X' ক্রোমোজোম সব কন্যারা পায় ও পুত্রের 'X' ক্রোমোজোম আসে মাতার থেকে (Criss Cross উত্তরাধিকার),

পিতা ♂ X মাতা ♀
XY XX

♀ \ ♂	X	Y
X	XX কন্যা	XY পুত্র
X	XX কন্যা	XY পুত্র

মানুষের ক্ষেত্রে প্রায় ৭০ রকম 'X' লিংক্ড বংশগত বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হল হিমোফিলিয়া ও বর্ণান্ধতা।

হিমোফিলিয়া –

ইহা 'X' ক্রোমোজোম বাহিত প্রচ্ছন্ন জিনের উত্তরাধিকার। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের কোনো ক্ষত বা কাটাস্থানে রক্ত তঞ্চন (রক্ত জমাট বাঁধা) যথাযথভাবে হয় না। এর ফলে সামান্য ক্ষত থেকে অবিরাম রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে এবং রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। এই রোগ কেবল পুরুষদের দেখা যায়, মহিলারা সাধারণত এই রোগের শিকার হয় না, তারা বাহক (X^hX) হয়। মাতার কাছ থেকে পুত্ররা এই রোগের জিন পেয়ে থাকে। মামাদের বংশেও এই রোগ থাকে। ফিলাডেলফিয়ায় বিজ্ঞানী জন কটো সর্বপ্রথম (১৮৩০ সালে) জন্মগত হিমোফিলিয়া রোগের হদিস দেন। ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার রাজ পরিবারে এই রোগের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। বহু প্রাচীনকাল থেকে রক্তপাত জনিত এই রোগের কথা জানা ছিল। ব্রিটেনের রাণী ভিক্টোরিয়ার হিমোফিলিয়ার জন্য দায়ী জিন ছিল। তাঁর এক পুত্রের (লিওপোল্ড) এই রোগ ছিল ও দুই কন্যা (অ্যালিস ও বিট্রাইস) এই রোগের বাহক ছিলেন।

অ্যাজিলার, বিগস, রোজেনথাল ও অন্যান্য বহু বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা যায় হিমোফিলিয়া সাধারণত তিন প্রকার। প্রতিটি ক্ষেত্রে রক্ত জমাট বাঁধতে প্রয়োজনীয় থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদন ব্যাহত হয়।

ক) সেক্স লিংকড "হিমোফিলিয়া A বা 'ক্লাসিক্যাল' বা 'রয়াল' হিমোফিলিয়া' – ৮০% হিমোফিলিয়া এই প্রকার, অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর (AHF) বা 'ফ্যাক্টর VIII' এর অভাব বা হ্রাস পাওয়ার জন্য হয়।

খ) সেক্স লিংকড "হিমোফিলিয়া B" বা "ক্রিস্টমাস রোগ" – প্রায় ২০% হিমোফিলিয়া এই প্রকার। রক্তে 'প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন' (PT) বা 'ফ্যাক্টর IX' এর অভাব বা কম উৎপাদনের জন্য ঘটে।

গ) হিমোফিলিয়া C – অত্যন্ত বিরল অটোজোমীয় জিনের প্রভাবে হয়, ১% এর চেয়ে কম হিমোফিলিয়া এই প্রকার। এই রোগে প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন অ্যান্টিসিডেন্ট (PTA) উৎপাদন ব্যাহত হয়।

'হিমোফিলিয়া A' রোগীর ক্ষেত্রে 'X' ক্রোমোজোমে অবস্থিত HEM-B জিনের ত্রুটি থাকায় AHF বা 'ফ্যাক্টর VIII' এর তৈরীর জন্য দায়ী প্রোটিনকে কোড করতে পারে না, ইহা 'X' ক্রোমোজোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন বংশগতি লাভ করে। যেহেতু পুরুষদের ক্ষেত্রে কেবল কোষে একটি 'X' ক্রোমোজোম থাকে সেই জন্য 'X' ক্রোমোজোমে যদি এই জিন থাকে তবে এই রোগ দেখা যায়। মহিলাদের এই রোগ দেখা যায় না কারণ তাদের ক্ষেত্রে হিমোফিলিক জিনের হোমোজাইগাস হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

পিতার হিমোফিলিয়া থাকলে ও মা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলে পুত্রের এই রোগ দেখা দেবে না, কিন্তু কন্যারা রোগের বাহক হবে। মা যদি এই রোগের বাহক হয় ও পিতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক

ক) পিতা হিমোফিলিয়া (X^hY), মাতা স্বাভাবিক (XX)

♀ \ ♂	X^h	Y
X	X^hX কন্যা	XY পুত্র
X	X^hX কন্যা	XY পুত্র

কন্যারা রোগের বাহক (X^hX), পুত্ররা স্বাভাবিক (XY)

খ) পিতা স্বাভাবিক (XY), মাতা বাহক (X^hX)

♀ \ ♂	X	Y
X^h	X^hX কন্যা	X^hY পুত্র
X	XX কন্যা	XY পুত্র

কন্যাদের ৫০% বাহক (X^hX), ৫০% স্বাভাবিক (XX)

গ) পিতা হিমোফিলিয়া (X^hY), মাতা হিমোফিলিয়া (X^hX^h) বিরল

♀ \ ♂	X^h	Y
X^h	X^hX^h কন্যা	X^hY পুত্র
X^h	X^hX কন্যা	X^hY পুত্র

কন্যারা সবাই হিমোফিলিক (X^hX^h) বিরল
পুত্ররা সবাই হিমোফিলিয়া (X^hY)

হয় তাহলে কোনো কোনো পুত্রের (৫০%) এই রোগ দেখা যাবে ও কোনো কোনো কন্যা (৫০%) এই রোগের বাহক হবে। মা হিমোফিলিয়ার বাহক ও পিতা হিমোফিলিয়া রোগী হলে কন্যাদেরও এই রোগ দেখা যেতে পারে, তবে এ সম্ভবনা বিরল।

বর্ণান্ধতা – (Colour blindness) – মানুষের ক্ষেত্রে লাল ও সবুজ বর্ণকে উপলব্ধি করার অক্ষমতাজনিত রোগকে বর্ণান্ধতা বলা হয়। এই রোগীরা লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না। তবে যথেষ্ট আলোয় গাঢ় লাল ও খুব গাঢ় সবুজ রঙের তারতম্য এরা বুঝতে পারেন। সাধারণত হালকা সবুজ ও হালকা লাল বর্ণের পার্থক্য এদের স্বল্প আলোয় বুঝতে অসুবিধা হয়, জনসংখ্যার প্রায় ৮% পুরুষের মধ্যে এই রোগটির উপস্থিতি দেখা যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই রোগটি বিরল। লাল-সবুজ নিয়ন্ত্রক জিনটি প্রচ্ছন্ন এবং এই জিনটি 'X' ক্রোমোজোমে থাকে। স্বাভাবিক মানুষের এই জিনের অ্যালিলের প্রভাবে চোখের রেটিনার কিছু আলোক সংবেদন কোষ (কোণ কোষ) তৈরী হয়, যার সাহায্যে তারা লাল-সবুজ বর্ণের পার্থক্য করতে পারে। কিছু একক জিন মিউটেশন হওয়ায় ওই জিন যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না ও লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা দেখা যায়।

পুরুষদের প্রতিটি কোষে একটি 'X' ক্রোমোজোম থাকে এবং ওই মিউট্যান্ট জিন এই 'X' ক্রোমোজোমে থাকলেই (X^C) তা ফেনোটাইপে প্রকাশ পায়। মহিলাদের দুটি 'X' ক্রোমোজোম (XX) থাকায় এরা সাধারণত স্বাভাবিক হয় ও খুব কম ক্ষেত্রে হোমোজাইগাস (X^CX^C) অবস্থায় বর্ণান্ধ হতে পারে। মহিলারা হেটারোজাইগাস অবস্থায় (X^CX) বাহক হয়।

বর্ণান্ধতা বংশগতি আগে বর্ণিত হিমোফিলিয়া রোগের বংশগতির মতো হয়।

বংশগত রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের তুলনায় মানুষের বংশগতি গবেষণা যথেষ্ট অসুবিধাজনক। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের উন্নতির জন্য, বংশগত রোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ন্ত্রিত প্রজনন করা হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এইরকম নিয়ম একেবারেই প্রযোজ্য নয়। সাধারণত মানুষের বংশ তালিকা বিশ্লেষণ করে বংশগতি সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হয়।

বর্তমানে মানুষের বংশগত রোগের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সম্ভব। তবে বংশগত রোগ যাতে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে যেতে না পারে তা সুনিশ্চিত করতে পারলেই বংশগত রোগের প্রতিকার সম্ভব। ক্ষতিকর জিন বহনকারী লোকের সন্তান হলেও তারা যাতে বংশগত রোগের শিকার না হয় তা সুনিশ্চিত করা উচিত।

নিচে বংশগত রোগ নির্ণয়, প্রতিকার ও চিকিৎসা সম্পর্কিত

কয়েকটি ব্যবস্থার উল্লেখ করা হল –

বংশতালিকা বিশ্লেষণ (Predegree Analysis) – কোনো বিশেষ জিনগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারের সম্ভবনা বা ধারা জানার জন্য কোনো পরিবারের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ওই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কাদের কাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা লক্ষ্য করা হয়। এভাবে বংশতালিকা বিশ্লেষণ করে ঐ বিশেষ চরিত্রটি কিভাবে জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা জানা যায়। কোনো বংশগত রোগের প্রাথমিক প্রকাশ ওই রোগীর বংশতালিকা বিশ্লেষণ করে নির্ণয় করা হয়। বংশতালিকা বিশ্লেষণ করে, বংশগত রোগ নির্ণয় ও পরবর্তী প্রজন্মে এই রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে জিন তত্ত্ববিদগণ সুনিশ্চিত পরামর্শ দিতে পারেন।

বাহক নির্ণয় (Carrier detection) – সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা বর্তমানে বহুক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন বা রিসেসিভ জিনের বাহক শনাক্ত করা যায়। হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া, বর্ণান্ধতা, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া সহ অন্যান্য রোগের বাহক নির্ণয় বর্তমানে সম্ভব।

অ্যামনিওসেন্টেসিস (Amniocentesis) – অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের অ্যামনিওটিক গহ্বর থেকে ইনজেকশন সিরিঞ্জের সাহায্যে অ্যামনিওটিক তরল সংগ্রহ করে তা থেকে ভ্রূণ কোষ নিয়ে তার ক্রোমোজোম পরীক্ষা করা হয়। ভ্রূণকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা, আকার, আকৃতি ইত্যাদি মানুষের স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের সঙ্গে তুলনা করে ভ্রূণের ক্রোমোজোম সংক্রান্ত পরিবর্তন বা ত্রুটি জানা যায়। মানুষের ডাউন সিনড্রোম, টারনার সিনড্রোম, ক্লাইন ফেল্টার সিনড্রোম ইত্যাদি অস্বাভাবিক অবস্থা ভ্রূণ অবস্থাতেই নির্ণয় করা যায় ও প্রয়োজনে ভ্রূণের গর্ভপাত (অ্যাবোরশন) করা হয়। তবে বর্তমানে এই পদ্ধতির অপব্যবহার করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ দ্বারা কন্যা ভ্রূণ হত্যার প্রবণতা বাড়ার জন্য গবেষণা ছাড়া সাধারণ প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবে এর প্রয়োগ আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জিন থেরাপি (Gene therapy) – বর্তমানে বংশগত রোগের চিকিৎসার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। যার সাহায্যে রোগীর ত্রুটিপূর্ণ জিনকে বাদ দিয়ে বা তার পরিবর্তন করে জিনগত রোগের চিকিৎসা সম্ভব। আমরা জানি যে নির্দিষ্ট জিনের কাজ হল নির্দিষ্ট প্রোটিনকে কোড করা। জিন থেরাপির মূল উদ্দেশ্যই হল ত্রুটিপূর্ণ জিনের পরিবর্তে সঠিক জিনের প্রতিস্থাপন, মানুষের প্রায় ৪০০০টি বংশগত রোগের মধ্যে মাত্র কয়েকটি জিন থেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়। তাদের অন্যতম হল আলফা ও বিটা থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, বামনত্ব, লিউকোমিয়া, জিনগত ক্যানসার, ফিনাইল কিটোনিউরিয়া, খ্রিস্টমাস রোগ ইত্যাদি।

জিন থেরাপি দুরকম ভাবে করা যায় ক) সোমাটিক জিন থেরাপি – রোগাক্রান্ত মানুষের দেহকোষে রেট্রো-ভাইরাস বাহকের মাধ্যমে স্বাভাবিক জিন প্রবিষ্ট করা হয়। স্বাভাবিক জিনটি সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক উৎপাদিত পদার্থ তৈরী করে এবং এভাবে কোষের ঘাটতি পূরণ হয়। এই পদ্ধতিতে রোগাক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা সম্ভব হলে ও রোগাক্রান্ত সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা থেকে যায়। খ) জার্মপ্লাজম বা হেরিটেবল জিন থেরাপি – এই পদ্ধতি দ্বারা গ্যামেট সৃষ্টিকারী মাতৃকোষের রোগ সৃষ্টি কারী জিন মাইক্রো ইনজেকশনের সাহায্যে বদল করে স্বাভাবিক জিন প্রতিস্থাপন করা হয়, এর ফরে স্বাভাবিক সন্তান উৎপাদন হয়।

জিনগত পরামর্শ – (Genetic councelling) – মানুষের বংশগত রোগের জিনগত অবস্থা নির্ণয়, পরবর্তী প্রজন্মে এই রোগগুলির নির্দিষ্ট সম্ভাবনা নির্দেশ করা হয়। এটি রোগীর বা বাহকের ডিএনএ টেস্ট, ক্যারিওটাইপ করে ক্রোমোজোম বিশ্লেষণ ও বংশতালিকা নির্ণয় দ্বারা সুনির্দিষ্ট জিনগত পরামর্শ।

বর্তমানে জিনগতভাবে অস্বাভাবিকতা যুক্ত মানুষের চিকিৎসা করে তাদের স্বাভাবিক করার চেষ্টা হচ্ছে। যেমন – ১) উৎসেচক কার্যকর করা – কোনো কোনো বংশগত রোগে নির্দিষ্ট উৎসেচক উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেগুলি কার্যকর না থাকায় রোগ দেখা যায়। যেমন এক ধরনের জন্মগত জন্ডিস রোগে ফেনোবার বিটল ব্যবহার করলে উৎসেচক সক্রিয় হয় ও জন্ডিসের লক্ষণ দেখা যায় না।

২) কো-ফ্যাক্টরের সরবরাহ – কোনো কোনো বংশগত রোগে কো-ফ্যাক্টর যেমন ভিটামিন বি সিক্স, বি টুয়েলভ সরবরাহ করলে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

৩) যে সব পদার্থের উৎপাদন জিনগত ত্রুটির ফলে ব্যাহত হচ্ছে সে সব পদার্থ রোগীর দেহে সরবরাহ করা। যেমন অ্যারোটিক অ্যাসিড ইউরিয়া রোগে ইউরিডিলিক অ্যাসিড ও সিটিডিলিক অ্যাসিড উৎপাদন ব্যাহত হয়। যদি রোগীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরিডিন দেওয়া হয় তাহলে এই রোগ প্রকাশ পাবে না।

৪) প্রতিযোগিতামূলক প্রতিরোধ – অক্সালোসিস রোগে গ্লাই-অক্সালেট, জল ও কার্বনডাই অক্সাইডে রূপান্তরিত না হয়ে অক্সালেট উৎপন্ন করে, এজন্য দেহে প্রচুর অক্সালেট সঞ্চিত হয়। রোগীকে সোডিয়াম হাইড্রোসোমিথেন সালফোনেট দিলে যে উৎসেচকগুলি গ্লাইঅক্সালেট থেকে অক্সালেট উৎপাদন করে তারা এই নতুন পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে, ফলে দেহে অক্সালেট সঞ্চিত হয় না।

৫) ওষুধ ব্যবহারে সাবধানতা – এরিথ্রোসাইট জি সিক্স পি ডি এর 'X' লিংক্ড জিনগত অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে কোনো কোনো ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক ওষুধ ও অন্যান্য কোনো কোনো ওষুধ মারাত্মক হতে পারে। ■

দ্বিতীয় বর্ষ❖সংখ্যা - ১❖জানুয়ারী ২০১২

সলিল চৌধুরী ও সঙ্গীতভাবনা

– প্রথম পর্ব –

[কিংবদন্তী সঙ্গীতকার সলিল চৌধুরীর কাজ ও সঙ্গীত ভাবনার বিভিন্ন দিক জনবোধ্য রূপরেখায় আমরা পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চাইলাম। অনেক দিকই হয়ত ছোঁয়া হল না। বিষয়ের সরলীকরণ করতে গিয়ে কোনো ক্ষেত্রে অজ্ঞাত ভুল থেকে থাকলে সচেতন পাঠক তা ধরিয়ে দেবেন। তাতে এই পত্রিকা সমৃদ্ধ হবে। মনে রাখবেন এটা কোনো পারদর্শিতামূলক জায়গা নয়। এটি কেবলমাত্র একটি প্রয়াস। এ লেখার উদ্দেশ্য হ'ল সঙ্গীতকে নিয়ে ভাবতে শেখানো।]

বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের আসামে জন্মগ্রহণ করে ছোটবেলা থেকেই সলিল চৌধুরীর সময় কেটেছে চা বাগানে ঘুরে ঘুরে চা শ্রমিকের দুঃখ-দুর্দশার লোকগান শুনে শুনে। বাবার কল্যানে বাড়ীতে পুরোনো গ্রামোফোন রেকর্ডে ইউরোপীয়ন ক্লাসিক্যাল মিউজিকের সাথে পরিচয়ও সেই ছোট্ট বয়স থেকেই।

তারপর বাবা তাঁকে পাঠিয়ে দেন তাঁদের এক আত্মীয়ের সাথে গ্রাম বাংলায় তার বাড়ীতে। গ্রামবাংলার নিজস্ব সুরের সাথে সলিলের পরিচয় সেখান থেকেই। হাতে থাকত বাঁশের তৈরী বাঁশি, তাই নিয়েই ছোট্ট সলিল ঘুরে বেড়াত গ্রামবাংলার বুকে।

সঙ্গীতে সলিল চৌধুরীর কোনো প্রথাগত শিক্ষা ছিলনা। পারিপার্শ্বিকই ছিল তাঁর সঙ্গীতালয়। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি, সাধারণ মানুষের জীবনই তাঁকে সুর দিয়েছে। তাঁর সুর-এর সাথে প্রাথমিক পরিচিতি সেই সময়কার সঙ্গীতকারদের সৃষ্ট সঙ্গীত থেকে যত না, তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষের জীবন থেকে। তাই তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনাকে সরিয়ে তাঁর সঙ্গীতের সার্বিক মূল্যায়ণ করা প্রায় অসম্ভব।

সলিলের কাছে সঙ্গীত ছিল তাঁর 'Expression'। তাঁর সমসাময়িক যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, তার প্রেরণাই সলিলী সঙ্গীত, সুর ও কথায় সেই Expression এনেছে।

৪০ দশকের সামাজিক অচলাবস্থা, দেশকে স্বাধীন করার আন্দোলন, ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর–এই সমস্ত কঠোর বাস্তব পরিস্থিতিকে সামনাসামনি মোকাবিলা করার মধ্য দিয়েই সলিল কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রেখেছিলেন।

এই সময় তিনি কলেজে ভর্ত্তি হয়েই মার্কসবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গান লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখা প্রথম দিককার গানে গ্রামবাংলার কৃষক ও ভাগচাষীদের ওপর বৃটিশ শাসকের অকথ্য অত্যাচার ফুটে ওঠে।

ধীরে ধীরে তিনি তাঁর বামপন্থী ভাবনা গানের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে শহুরে ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রভাব ফেলার চেষ্টা চালান। ইতিমধ্যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘর (IPTA) নেতৃত্ব তাঁর প্রতিভাকে চিনতে পারেন এবং তাঁকে তাঁদের মঞ্চে যোগ্য স্থান দেন।

খুব অল্প সময়ে সলিল IPTA-র মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। তাঁকে ঐ মঞ্চ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় এমন গান রচনার যা যেকোনো সমাবেশে গাওয়ার উপযুক্ত। সলিল সেই নির্দেশ মেনেই এমন একটি গান রচনা করলেন যার বক্তব্য সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্যকে সামনে রেখে।

সলিল চৌধুরীর আগমনের পূর্বেই রাজনৈতিক বক্তব্যধর্মী

গান নিয়ে কাজ চলছিল। তবে তা রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পর এক অর্থে থেমে যায়। যদিও রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ভাবধারায় পুষ্ট গান রচনার ক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন না। উত্তাল সামাজিক পরিবেশের অস্থিরতায়ও তাঁর কলম আত্মমগ্নভাবের ঘোরে কাব্যের উৎকর্ষতা চর্চায় ব্যস্ত থাকে। দেশপ্রেমধর্মী গানের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর গান ও সাহিত্যে বিপরীত দর্শনের ভাবনাও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের গানে কখনওই বৃটিশ সরকারের শাসন উচ্ছেদ করে দেশকে মুক্ত করার সরাসরি আহ্বান ছিল না। যাই হোক, দ্বিজেন্দ্র লাল সে সময়ে তাঁর গানে কথার ব্যপ্তি ও সুরের ব্যাঞ্জনা দিয়ে শহুরে মধ্যবিত্তর রাজনৈতিক চেতনাকে নাড়া দেন। তবে সেই সমস্ত গান ছিল দেশপ্রেমধর্মী গান যা দেশকে মাতৃরূপে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল। মায়ের কষ্ট-লাঞ্ছনার কথা তার বীরসন্তানদের জানাতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সে সময়ে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত তাঁর কলম কখনো আঁকাবাকা পথে এগিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেনি মানুষকে। নিজ বিশ্বাস ও আদর্শে অটল থাকার অঙ্গীকার প্রগতিশীল সঙ্গীতকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালকে এক অন্য স্থান দিয়েছে।

গ্রামবাংলা থেকেও বহু রাজনৈতিক গান রচিত হয়েছিল যেগুলো তৎকালীন শহুরে রাজনৈতিক গানের তুলনায় অনেক বেশি বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন। মুকুন্দদাস তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। এই গানগুলির কথার ধরন ছিল সোজাসুজি ও আক্রমণাত্মক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের গর্জে ওঠার ইতিহাস সমৃদ্ধ। বহু ভারতীয় বীর সন্তানের আত্মত্যাগ ও বৃটিশ পুলিশের সন্ত্রাস রাজনৈতিক গান রচনায় নতুন শক্তি যুগিয়েছে, নতুন পথ দেখিয়েছে। এই পথের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সুর ও কথা বাংলা গানকে এক সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে শেখাল। নজরুল প্রথম তাঁর গানের কথার মধ্য দিয়ে দেশকে ইংরাজ শাসনের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত করার দাবী তুললেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গতে নজরুল লিখলেন – 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট'। আধুনিক রাজনৈতিক বাংলা গান তার ধারালো সংগ্রামের পথ বেছে নিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি উচ্ছেদ দাবী করে। গান সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য ও প্রতিবাদ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠল। গণগণে বৈপ্লবিক শব্দ খুঁজে নিল তার Expressive ছন্দ ও সুর। পাশ্চাত্যের সরাসরি প্রভাব পড়ল তালের মধ্য দিয়ে। এই প্রথম আধুনিক বাংলা গানের প্রয়োজনেই আমদানী হল পাশ্চাত্য সঙ্গীতের MARCHING BEAT। রচিত হল – "একসূত্রে বাঁধা আছি", "ওঠো গো ভারতলক্ষ্মী", "বল বল বল সবে", "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা", "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা" এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের নজরুল অনুদিত বাংলা রূপ – "জাগো অনশন বন্দী ওঠো রে যত"।

ভারতীয় মার্ক্সবাদীরা সেই সময় কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ভারতীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাও সেই সুবাদে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি এবং বঞ্চিত জনগণের দাবীকে নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভাষায় Express করতে চাইছিলেন। তার পাশাপাশি মানুষকে তার মুক্তির পথ দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে নতুন ধরনের রাজনৈতিক গানের তরঙ্গ তৈরী করলেন। এই বিশেষ ধরনের গান যা কিনা মূলত সেই সময়কার বামপন্থী সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেরই ফসল, ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই বিশেষ ধরনের গান কিন্তু সঙ্গীতের নতুন কোনো ধারা নয়। মানুষের রাজনৈতিক আন্দোলনই ধীরে ধীরে তীব্র হতে হতে একসময়ে এই ধরনের গানের জন্ম দিল। যার মধ্যে একদিকে যেমন সামাজিক রাজনৈতিক সংকট তার প্রকাশের ভাষা পেল, তেমনি সাধারণ জনগণকে এই সংকটমোচনের পথ দেখানো হল। জন্ম হল 'গণসঙ্গীতের' যা সাধারণ জনগণের জীবনের গান।

৪০ এবং ৫০ দশকের মধ্যবর্ত্তী সময়ে IPTA-র হাত ধরে মানুষের সংগ্রামের পথকে সুগম করল গণসঙ্গীত। সারা ভারতের যুবসমাজকে নাড়া দিয়ে এক নতুন জোয়ার এনে দিল। বুঝতে হবে পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতকার হিসাবে IPTA-র এই ঐতিহাসিক মঞ্চে ঠিক এই সময়েই কিন্তু সলিল চৌধুরীর আগমন। শিল্প সমাজের দর্পণ। শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এমন সঙ্কটজনক সামাজিক পরিস্থিতিই হয়ত যুগের চেয়ে এগিয়ে সঙ্গীতের পথপ্রদর্শক হিসাবে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সলিলের সহায় হয়েছিল।

তবে গণনাট্য সংঘের ইতিহাসে গণসঙ্গীতকে জন্ম দেওয়া ও জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে সলিল চৌধুরীর ঠিক আগে যাঁদের কথা না বললেই নয়, তাঁরা হলেন – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, বিনয় রায়, হরিপদ কুশারী এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এঁরাই গণসঙ্গীতের ধারায় সলিল চৌধুরীর সরাসরি পথপ্রদর্শক। সলিল তাঁদের কাজ ও Composition-কে নমুনা হিসাবে পেয়ে যান, যা তাঁকে তাঁর নিজের কাজের ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করে।

সলিল তাঁর সঙ্গীত জীবনে আরেকভাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কাছে ঋণী হয়ে থেকেছেন। তিনি নিজে তাঁর এক সাক্ষাৎকারেই বলেছিলেন যে, IPTA-র বহু সম্মেলন হত ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। সেখানে বহু সঙ্গীতকার আসতেন। তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হত। এই সম্মেলনগুলি ছিল সলিলী ভাষায় অনেকটা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। তিনি তাঁর মনন দিয়ে আপ্রাণ আহরণ করেছেন সেখান থেকে, পরবর্তীকালে যা তাঁর সঙ্গীতে প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন-সলিলের বিখ্যাত গণসঙ্গীত– 'মানবো না এ বন্ধনে, মানবো না এ শৃঙ্খলে' অন্ধ্রপ্রদেশের একটি সুর থেকে নেওয়া।

রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে সলিলও তাঁর সম্পূর্ণ সঙ্গীত জীবনে দেশ-বিদেশের সঙ্গীত শোনার ক্ষেত্রে কোনো বাছবিচার রাখেননি। তাদের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন। কিন্তু সেই প্রভাব কখনো অনুকরণে পরিণত হয়নি। সলিল এলোপাথারি সঙ্গীত শুনেছেন, তাকে প্রয়োজন মত modify করেছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিজস্ব ভঙ্গিতে নতুন পরিস্থিতিতে তাকে পরিবেশন করেছেন।

যেমন তাঁর জনপ্রিয় প্রতিবাদী গানটির কথাই ধরা যাক। "বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা"। গানটি ইংরাজ শাসনের হিংস্রতার বিরুদ্ধে বন্দী ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিচারের নামে যে প্রহসন হয়েছিল তার বিরুদ্ধে লেখা। এতদিন মানুষ অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে এসেছিল। কিন্তু এই গানটির কথায় আমরা দেখতে পাই শুধু ক্ষোভ প্রকাশ নয়, বরং সেই বিচারপতি অর্থাৎ দেশে বিচারব্যবস্থাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন সলিল। সলিল এই গানটির সুর খুঁজে পেয়েছিলেন বাংলা একটি কীর্ত্তনের সুর থেকে। গানটি ছিল – "তুমি কি সেই যমুনে সেই যমুনে প্রবাহিনী"। সেই কীর্ত্তনের সুরটি ছিল আধ্যাত্মবাদী আত্মত্যাগে নিমজ্জিত, অর্থাৎ এককথায় ভক্তিরসে ভরপুর। সলিল এই সুরটিকে নিলেন বটে, তবে তাকে প্রয়োগ করলেন নিজস্ব ধাঁচে জ্বলন্ত প্রতিবাদের ভাষায়। সুর এক থাকলেও Expression গেল পাল্টে। জন্ম নিল নতুন মেজাজ।

বলাই বাহুল্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর সময়ে এই একই কীর্ত্তনী সুরের প্রেমে পড়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গান – "ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি, নিয়ে যাবি কে আমারে" এই সুর থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু তিনি মূল সুরটির ধারাটিকে না পাল্টেই ব্যবহার করলেন তাঁর গানে। পরবর্ত্তীকালে উস্তাদ বিলায়েত খাঁ-ও তাঁর সেতারী ভাষায় একই ভাবে ও আঙ্গিকে ধরলেন সুরটিকে। কিন্তু সলিল মাঝে রয়েছেন। তিনি সুরটিতে ঝাঁকলেন, প্রভাবিতও হলেন, ব্যবহার করার সময় তৎকালীন সময়ের দাবীকে অস্বীকার করতে পারলেন না। কোমল সুর রূপান্তরিত হল বিদ্রোহের ঝংকারে। পুরোনো গানের গর্ভ থেকে জন্ম নিল নতুন সমাজের ভাবধারায় পুষ্ট নতুন সন্তান।

সলিল চৌধুরীর সঙ্গীতের এই নতুন দিক্‌দর্শন আধুনিক বাংলা গানের যুগ পরিবর্তন করল। সে যুগের দমকা হাওয়ায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল চিরাচরিত বিদ্রোহী গানের ভাবনা, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছিল 'গণসঙ্গীতের' পথ চলা।

এরপর থেকে অর্থাৎ ১৯৪৫-১৯৫০-এর মধ্যে সলিল বহু জনপ্রিয় গণসঙ্গীত রচনা করেছেন। এগুলো শুধু রাজনৈতিক বক্তব্যকেই মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়নি, সাথে সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন Style-এ কথা ও কাব্যের Experiment-ও ঘটিয়েছে। গণসঙ্গীতের কথাগুলির বাচনভঙ্গি ছিল অনেকটা সরাসরি। তবুও তার বোধের সূক্ষ্মতা, শব্দের প্রয়োগ ও pictorial representation শিল্পের স্বাধীনতাকে কখোনোই কোনঠাসা করেনি।

কিন্তু সলিল চৌধুরীর সমস্ত গানই সময়ের সাথে সাথে আবর্জনায় পরিণত হতে পারত যদি না তার গঠনতন্ত্রের এমন আমূল রূপান্তর ঘটত। সলিলের স্বকীয়তা এবং সুর বৈশিষ্ট্য তাঁর সঙ্গীতের গঠনকাঠামো, শব্দের নতুন প্রয়োগ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক, শব্দ ও সুরের ছন্দবদ্ধতার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। ৪০ ও ৫০ দশকের সঙ্গীতকার হিসাবে তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তাঁর পূর্বসূরীরা। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কাজী নজরুল ইসলাম এবং হিমাংশু দত্ত-র কাজ সলিল সঙ্গীতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন composer ও গীতিকার হলেও হিমাংশু দত্ত ছিলেন কেবলমাত্র composer। এঁরা চারজন সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করেছেন, কথার সাঙ্গীতিক প্রকাশ নিয়ে দেশ-বিদেশের music ঘেঁটেছেন এবং নতুন নতুন musical pattern তৈরী করেছেন যা তাঁদের আগে সম্পূর্ণরূপে অচর্চিত ও অজ্ঞাত ছিল। বাংলার লোকগীতি বা folk music, হিন্দুস্তানী রাগসঙ্গীত, দক্ষিণ ভারতীয় সুর এবং ইউরোপীয় classical ও popular music দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এঁরা নিজেদের composition-এ তা প্রয়োগ করেন। এইভাবেই ১৯শ শতকের ৪এর দশকে বাংলা সঙ্গীতে প্রাচ্যের সাথে হাত মেলাল পাশ্চাত্য। দিলীপ কুমার রায় যিনি কিনা স্বনামধন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র, তাঁর সাথে এক কথোপকথনে একবার রবীন্দ্রনাথ বলেন – 'আমাদের কি কোনো বিশেষ রায়ের জন্য অপেক্ষা

করে থাকা উচিত যে কোনটি বাংলার নিজস্ব আর কোনটি বাইরে থেকে আনত ? দেখ, যদি ইউরোপীয় সুর তোমার বাবার গানকে নতুন রূপ দিতে পারে, তাতে অন্যায় কি রয়েছে ? অন্ধ অনুকরণ সত্যিই খারাপ, কিন্তু আত্তীকরণ নয়। ইউরোপ দু'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের কি এখন যন্ত্রের মত নিজস্বতা বজায় রাখতে গিয়ে তাদের এই উপহার বর্জন করা উচিত ?'

৪০ থেকে ৫০ দশকে সলিল চৌধুরীর composition-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকই ছিল কোনো প্রথাগত নিয়ম না মানা, বরং প্রথাগত নিয়ম ভেঙ্গেই নতুন নিয়ম তৈরী করা। সঙ্গীতের কোনো ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনেই তিনি নতুন ধারার যে pattern তৈরী করেন তার দু-এক লাইন শুনলেই 'সলিলী শৈলী'-র ছোঁয়াচ মিলত। তাঁর প্রতিটি composition এই তিনি নতুন নতুন ধারার জন্ম দিয়েছেন।

তিনি তালের ক্ষেত্রে নতুন বৈচিত্র্য আনলেন যা কিনা রবীন্দ্রনাথের পর আর কাউকে তেমন সফলভাবে করতে দেখা যায় না।

বাংলা সঙ্গীতের প্রথাগত নিয়ম ভেঙ্গে তিনি নতুন structure বানালেন যা একই কথার বহু অভিব্যক্তি বোঝাল। একই সুরে Expression-এর আঙ্গিক পরিবর্তন করে সুর ও ভাবকে তিনি বহুমাত্রিক করে দিলেন। এটি অবশ্যই আধুনিক বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

এর আগে একটি গানের একটি কথার বা লাইনের একটিই সুর থাকত কিংবা বড়জোর দুটি। মানে মূল সুর ও তার সাথে আরেকটি অনুরূপ সুর যা মূল সুরটিকেই প্রায় নকল করে এগোতো। কিন্তু সলিলের composition-এর সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তিতে বহুমাত্রিক বা multi-dimensional সুরপ্রয়োগ ঘটল। অর্থাৎ মূল সুরকে অটুট রেখে তার সহায়ক হিসাবে যতরকম সুরের composition হতে পারে, যা সঙ্গীতকে এক নতুন গতি সঞ্চার করল।

আগেই বলা হয়েছে সলিল শুধু সুরেই বৈচিত্র্য আনেননি, কথার বহুমাত্রিকতা তাঁর লেখা গানের বৈশিষ্ট্য ছিল। একই কথার যদি দ্বান্দ্বিকভাবে অনেকগুলো ভাব থাকে তাহলে সে কথা স্বাভাবিকভাবেই বহুমাত্রা পায়। কিন্তু সুরের ক্ষেত্রে যদি একমাত্রা প্রয়োগ করা হয়, তখন তা বহুমাত্রিক কথার Expression-এর ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। মূল সুর তো মূল কথার বোধকে ফুটিয়ে তোলে। পারিপার্শ্বিক অন্য বোধগুলিকে ধরতে সুরকেও বহুমাত্রিক হতে হয়। তবেই কথা ও সুর সঙ্গীতের মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক উপায়ে বিকশিত হয়ে নতুন form বা গঠন পায়।

সঙ্গীতের structure নিয়ে সলিল চৌধুরীর এই নিরবচ্ছিন্ন গবেষণাই তাঁকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের যেকোনো ভারতীয় সঙ্গীতকারের থেকে সন্দেহাতীতভাবেই আলাদা স্থান দিয়েছিল।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সলিল চৌধুরীর সবচেয়ে বড় অবদান হল **সুরের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশের পদ্ধতি আবিষ্কার করা**। এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতম নমুনা তিনি রাখেন তাঁর দুটি যুগান্তকারী কাজের মাধ্যমে। একটি হল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর লেখা 'পাল্কীর গান' ও অপরটি হল সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের লেখা 'রাণার'। এ দুটি কবিতাকে সঙ্গীতে রূপান্তরের technical analysis অর্থাৎ স্বরলিপি ধরে ধরে ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে অনেকেই নিশ্চিদ্রভাবে করেছেন। কিন্তু সলিলের এই কাজকে সাঙ্গীতিকগুণে বিচার করতে গেলে আমাদের একটু অন্যভাবে গোড়ার কথায় যাওয়া দরকার। কবিতার প্রতিটি লাইন এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গানটি প্রায় প্রত্যেকে-ই জানেন এবং শুনেছেন। তা নিয়ে আশা করি বলার বিশেষ দরকার নেই। কিন্তু যেকোনো কবিতার কোনো বক্তব্য বা ভাবকে সঙ্গীতে রূপান্তরের সময় প্রথমেই যা করা দরকার তা হল কবিতার সুস্পষ্ট অর্থটি আবিষ্কার করা। এখন এই অর্থ আবিষ্কার করতে গিয়ে কিংবদন্তী শিল্পীর সামনে অনেক challenge এসে যায়। 'রাণার' গানটির উদাহরণই নেওয়া যাক। এটি একটি ডাকহরকরার জীবনের গান যে কিনা একস্থান থেকে অপর স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় খবর ভোরের মেল ট্রেনে পৌঁছে দেয়। সুকান্তও কবিতার চিত্রপটে সে ছবিই এঁকেছেন। শুধু এই ছবিটিকেই সলিল যদি তাঁর সঙ্গীতে ধরতে চাইতেন তাহলে কিভাবে ধরতেন ? এটি একটি চিত্রকল্প, যা মূলত বর্ণনাধর্মী। তাই স্বাভাবিকভাবেই সঙ্গীতের চরিত্রও হবে বর্ণনাধর্মী অর্থাৎ সুর দিয়ে Scene to scene describe করে যাওয়া। এ জিনিষ গানে পূর্ব থেকেই হয়ে এসেছে, তাই এটি নতুন কিছু নয়।

কিন্তু 'রাণার' কবিতায় শুধুই চলার বিবরণ নেই যা কিনা কবিতার মূল জায়গা। কেন নেই ? কারণ বাস্তব সামাজিক পরিবেশে কাউকে চলতে হলে সে চলা নিরবচ্ছিন্ন বা smooth হয়না, তাতে সামাজিক বাধা এসে পড়ে। ব্যস্, সলিল পেয়ে গেলেন তাঁর আসল clue। এই বাধাই রাণারের গতিপথকে সোজাসুজি না নিয়ে গিয়ে বক্র করেছে। তাহলে আমাদের হাতে কি কি factor এসে গেল ? এক, রাণারের স্বাভাবিক এগিয়ে চলা, দুই, সেই গতিপথের বাধা এবং তিন, এই

দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই রাণারের চলাকে এক নতুন মাত্রা দিল। একমাত্রিক চলা হয়ে উঠল দ্বিমাত্রিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক।

'রাণার' কবিতায় আরও অনেক দ্বন্দ্ব রয়েছে। যেমন–(১) মানুষের কাছে বিভিন্ন অভিব্যক্তির বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানো এবং যদি তা না হয় তবে তার নিজের জীবনের চরম সঙ্কটবার্তা, (২) 'পিঠেতে টাকার বোঝা তবু ঐ টাকাকে যাবে না ছোঁয়া' – অর্থাৎ জীবনের সমস্যা মূলত যে কারণে তার সমাধানও তার পিঠেই, কিন্তু তা তার নিজের নয় বরং বোঝাস্বরূপ - তাই এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব, (৩) 'অবাক রাতের তারারা আকাশে মিটিমিটি করে চায়, কেমন করে রাণার সবেগে হরিণের মত যায়' – অর্থাৎ রাণারের চলার গতিকে এখানে supreme ধরা হয়েছে এবং পরবর্ত্তীতে 'রাত নির্জন পথে কত ভয়' - তার supremacy কে realistic বা বাস্তবসম্মত করা হয়েছে – অর্থাৎ গতি ও বাধার দ্বন্দ্ব, (৪) 'ভোর' শব্দের দ্বিমাত্রিক অর্থের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। প্রথম 'ভোর' একটি সুনির্দিষ্ট সময় বোঝায় যে সময়ে রাণারকে মানুষের খবর ভোরের মেল ট্রেনে পৌঁছে দিতে হবে এবং দ্বিতীয় 'ভোর'টি হল রূপক অর্থে তার এই আর্থিক অন্ধকারময় জীবনের প্রথম আলো। এছাড়াও ছোট ছোট আরো অনেক দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে আছে এই কবিতার মধ্যে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শোষিত মানুষের জীবনের এই মোড় গুলোকেই যদি দেখাতে হয় তবে সেখানে রাণারের পেশাটিকে বাছা হল কেন ? কায়িক শ্রমের এই নিদর্শন তো অন্য পেশাতেও ছিল, এবং গতিশীলভাবেই ছিল। যেমন- একটি রিক্সাওয়ালার জীবনকেও ভাবা যেতে পারত যে সরাসরি মানুষের বোঝা পিঠে নিয়ে মানুষকে তার গন্তব্যে সময়মতো আরামদায়কভাবে পৌঁছে দেয়, কিন্তু নিজের আরাম বা গন্তব্যের কোনো ঠিক থাকেনা। এই প্রশ্নেরই উত্তর লুকিয়ে আছে 'রাণার' কবিতার মৌলিক দ্বন্দ্বের মধ্যে। কি সেই দ্বন্দ্ব?

বাকী অন্যান্য সমস্ত পেশার সাথে রাণারের পেশার**কাজের সময়ের অমিল**। মানুষ কাজ করে দিনে আর রাত্রে সে ঘুমোয়। কিন্তু রাণার কাজ করে রাত্রে। সুকান্ত কবিতায় বলেছেন – "ঘরে তার প্রিয় একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।" 'বিনিদ্র' মানে 'নিদ্রাহীন' অর্থাৎ 'জেগে থাকা'। একই লাইনে বিনিদ্র'র পর 'জাগে' শব্দটি প্রয়োগের অন্য কোনো প্রয়োজন ছিলনা একমাত্র এই দ্বন্দ্বকে emphasize করা ছাড়া।

একা রাণার রাতে চলে বলেই তার বন্ধু বা সহায় হয় প্রকৃতি। তাই সে নমুনাও এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পায় যা দিনের বেলায় অনেকের সাথে চলা হলে হয়ত তেমন মাত্রা পেতনা। তাই "দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি',-একে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি।"

এর বেশি বলার দরকার নেই। পাঠকরা এই অবধি পড়েই বুঝতে পারবেন কি আসলে বলতে চাইছি। যা বলতে চাইছি এককথায় তা হল - দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে না প্রয়োগ করলে বাস্তবকে সঠিকভাবে ধরা যায়না। তাতেই বক্তব্য হয়ে পড়ে দুর্বল, ঠুনকো এবং একমাত্রিক। তার ফলে তা হয়ে যায় গতিহীন। 'দ্বন্দ্বই' শিল্পকে গতিসঞ্চার করে, যে গতি আবার এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, বিকশিত হওয়ার পথকে সুগম করে। প্রতিটি ভাবনার মধ্যেই দ্বন্দ্ব থাকে। সচেতন ব্যক্তির কাজ হল তাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যা তার উন্নতির চর্চার ক্ষেত্রে একমাত্র সহায় হবে। তা না হলে তা নেহাৎই শব্দের সমষ্টি হয়ে থাকে, শিল্প হয়না।

সলিলও এই কাজটিই বৈপ্লবিকভাবে করেছিলেন 'পাল্কীর গান' ও 'রাণার' গানের সুরারোপণের মধ্য দিয়ে। বক্তব্যের এই দ্বান্দ্বিক গতি রাণারের নিজস্ব গতির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এই ছিল সলিলের দর্শন। এই দর্শনকে তিনি প্রয়োগ করেছেন সাঙ্গীতিক টেকনিকের নানা উপায় প্রয়োগ করে।

রবীন্দ্রনাথও প্রচলিত 'কবিতা থেকে গান'-এর ব্যাপারে আগে নমুনা রেখে গেছেন। কিন্তু সলিলের নিজস্ব অবদান যে কি সে তো আগেই বললাম। এবার দেখব কিভাবে এই দার্শনিক ভাবনা তিনি প্রয়োগ করলেন তাঁর শিল্পে।

সলিলের কাছে সঙ্গীত ছিল Expression আগেই বলেছি। বহুমাত্রিক ভাবনাকে Express করতে কিভাবে সুরকে তিনি বহুমাত্রিক করলেন এবার সেটিই কয়েকটি নমুনার মাধ্যমে দেখুন।

(১) 'রাণার' কবিতার মূল বর্ণনামূলক অংশকে ধরলেন ছন্দ ও ভৈরব রাগ দিয়ে। এই ছন্দ অনেকটা ঘোড়ার চলার টগবগে ছন্দের মতন। মনে মনে গানের সাথে ছন্দটি কল্পনা করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। 'ভোর' যেহেতু এই বক্তব্যের অন্যতম 'দ্বন্দ্ব', তাই তিনি গানের শুরুতেই ভায়রো রাগের note ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিলেন-এখন যাই কথা বলিনা কেন, অবশেষে পৌঁছোবো সেই ভোরের আলোয় যে আলোর স্পর্শে রাণারের এই দুঃখের কাল কাটবে। 'কাল' শব্দটিরও অদ্ভুতভাবে দ্বর্থক ব্যবহার - এক তো সময়কাল অপরটি নিয়তি।

(২) চলার গতির বাঁকগুলো নিলেন ছন্দের pattern ও

ছন্দের গতি (tempo) পরিবর্তন করে।

(৩) এক স্থান থেকে আরেক স্থান এ position change কে ধরলেন সুরের 'সা' note-এর position change-এর মধ্যদিয়ে। একে সাঙ্গীতিক ভাষায় 'খরজ পরিবর্তন' (Tonic change) বলা হয়।

(৪) 'দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে' – এই দুই দিগন্তের মধ্য পার্থক্য করার জন্য এক 'দিগন্ত'-এ major chord ও অপর 'দিগন্ত'-এ minor chord ব্যবহার করলেন।

(৫) 'দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি' – লাইনটিতে কীর্ত্তনের সুরও ব্যবহার করেছেন। এই সুরটি হারমোনিয়ামে একটু জড়িয়ে বাজালে এই ব্যবহার বোঝা যায়।

(৬) সর্বোপরি রাণারের চলার বৈশিষ্ট্যর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তার সুর ধরাবাধা মুখড়া, অন্তরা হয়ে আবার প্রথমে ফিরে আসেনি। কারণ রাণার তো একস্থান থেকে অন্যস্থান, সেখান থেকে আবার অন্যস্থান এভাবে চলে বেড়ায়। তাই উৎস এবং গন্তব্য কখনোই একসাথে মেলেনা। তাই সুরের pattern ও সেই ধারা মেনেই প্রচলিত ধারাকে ভেঙ্গে নতুন যুগান্তকারী আবিষ্কারের পথে এগিয়ে গেছে।

সঙ্গীতকে বহুমাত্রিকভাবে বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে orchestra-র ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। 'orchestra' শব্দটির মানে সাধারণভাবে 'group' বা 'assembly' অর্থাৎ একসাথে বহুবাদ্যযন্ত্রের সমাহার আর তাদের সংঘবদ্ধ ব্যবহারকেই orchestration বলা যেতে পারে। সঙ্গীতে কিন্তু orchestra-র ব্যবহার সলিল চৌধুরীর আগমনের বহু আগে থেকেই। অর্থাৎ কেউ গান গাইছেন, তার সাথে নেপথ্যে অবিকল সেই মূল সুরকে হুবহু অনুকরণ করেই বহু যন্ত্র একসাথে বাজছে এবং এক stanza যখন শেষ হচ্ছে তখন বাদ্যযন্ত্র হয় শেষ লাইনটিকেই আরেকবার এককভাবেrepeat করছে নয়ত যদি কোনো theme line থেকে থাকে তাকে অবিকলভাবে repeat করছে। তার পরেই কথার পরের stanza শুরু হচ্ছে। এই ছিল সঙ্গীতে orchestration-এর ভূমিকা।

সলির তাঁর সঙ্গীতে orchestration প্রয়োগ করলেন এক নতুন style-এ। তিনি উপলব্ধি করলেন, যে সুর গলায় গীত তাকে যন্ত্রসঙ্গীতে হুবহু নকল করে বাজিয়ে বাহুল্য প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন থাকে না, যদি না তার text সেই বাহুল্য দাবী করে। বরং যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার হওয়া উচিত কণ্ঠসঙ্গীতের পরিপূরকরূপে, অর্থাৎ যত দূর কণ্ঠ-সঙ্গীত Express করল তার পরের Expression দেওয়ার ক্ষেত্রে। আমরা নিজেদের বোঝার সুবিধার্থে এটিকে hand shaking ভূমিকাও বলতে পারি।

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দিল। সঙ্গীতকে যদি সামাজিক বিশ্লেষণের জায়গা থেকে দেখা যায় তাহলে এই সমস্যাটি ব্যাখ্যা করা যায় এবং সমাধান করাও সম্ভব হয়। সঙ্গীতে মূলত তিনটি ভূমিকা থাকে –

(১) গীত রচনা যা করেন গীতিকার

(২) সুর রচনা যা করেন সুরকার এবং

(৩) orchestral arrangement যা করেন orchestral arranger.

যদিও আলাদা আলাদা বিভাগ তবুও তিনজনের সংঘবদ্ধ প্রয়াস একসাথে মিলিত হলেই **শিল্পকলা** সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঘটনা যদি এমন হয় যে, গীতিকার শব্দ প্রয়োগ করলেন, শব্দের সেই ব্যঞ্জনা সুরকার সেভাবে দেখলেনই না এবং অনুরূপভাবে arranger ও একই ভুল করলেন। সেক্ষেত্রে সুর-কথা ও পরিবেশনার মধ্যে সুষ্ঠু ঐক্য হবার চাইতে দ্বন্দ্ব তীব্র হল। অর্থাৎ **শিল্প** সৃষ্টি হল না। তিনজনের কোনো একজনের interpretation-এর খামতি থাকলেই এই পরিণতি অনিবার্য।

এখন দেখুন এই সমস্যা কিভাবে সামাজিক। ধরুন একজন ব্যক্তিই যদি এই তিনটি ভূমিকাই পালন করতেন তাহলে তো এই সমস্যা উঠতই না। কিন্তু তা ব্যাপক অর্থে সম্ভবও হয়ে উঠত না সঙ্গীত উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে।

যে সমাজে আমরা রয়েছি তাতে যেকোনো উৎপাদনের ক্ষেত্রেই দেখতে পাই উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কিভাবে শ্রমের বা কাজের বিভাগ করা হয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তো ভালো ব্যাপার কারণ তা বাড়লে বহুমানুষ সেই পণ্যের ব্যবহার করতে পারবে যদি তাদের ক্রয়ক্ষমতা থাকে। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই কাজের বিভাগীকরণ করার পাশাপাশি ভূমিকারও আদানপ্রদান না করলে কখনোই এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। যিনি গান রচনা করছেন তাঁকে যেমন সুরের ব্যাঞ্জনা প্রকাশও শিখতে হবে তেমনি যিনি arranger তাঁকেও বাকীদের ভূমিকা সমানভাবে শিখতে হবে। অর্থাৎ সঙ্গীতের কারিগরদের শিক্ষিত করতে হবে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায়। এই শিক্ষা ব্যবস্থাই আবার প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। ফলে সাঙ্গীতিক দ্বন্দ্ব আসলে সামাজিক দ্বন্দ্বরই রূপ নিল।

সলিল চৌধুরী হয়ত এই কারণেই নিজের লেখা কথায় নিজেই সুর বসিয়ে তাকে compose করতেন এবং orchestral arrangerment ও নিজেই করতেন। তিনি যন্ত্রসঙ্গীতকে কথা বলাতে শেখালেন। তাঁর সঙ্গীতে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার

ছিল information content হিসাবে। তিনি সুর দিয়ে শ্রোতাদেরকে inform করতেন বা পরিচিত করাতেন বিষয়বস্তুর সাথে। এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্তমূলক নমুনা দেওয়া যেতে পারে।

লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে একটি খুব জনপ্রিয় গান রেকর্ডেড হয়েছিল বাংলা ও হিন্দী দুই ভাষাতেই। গানটির শিরোনাম বাংলায় – 'ও বাঁশী, বাঁশী কেন গায়'। কিন্তু দুই ভিন্ন ভাষায় recording-এর সময় সলিল সঙ্গীতের প্রেক্ষাপট পাল্টে দিলেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই বিশেষ প্রয়োগকে বলা হয় 'mood change' বা 'মেজাজ পরিবর্তন'।

হিন্দী গানটির ব্যবহার হয়েছিল বম্বে'র একটি ফিল্মের প্রয়োজনে। তাই তাতে interlude রচনায় ব্যবহার করলেন বেশিরভাগই western musical instrument চড়াভাবে। কিন্তু বাংলা গানটির রেকর্ডিং-এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে - orchestration-এর কথা বলার ভঙ্গি পাল্টে দিলেন। বিখ্যাত বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরই সলিল এই গানটি রচনা করেন। এই লেখার শুরুতেই বলেছি, যে বাদ্যযন্ত্রটির সাথে সলিলের প্রথম আলাপ তা হল 'বাঁশি'। পান্নালাল ঘোষ ছিলেন তাঁর গুরু স্থানীয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ সলিলকে তাড়িত করে। এই তাড়নাই তারসানাইয়ের তীব্রভাবে আর্ত সুরে interlude-এ বেজে ওঠার মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে দুঃখকে inform করল।

সঙ্গীতে সলিল চৌধুরীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হল মানুষের কণ্ঠকে এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে যন্ত্রসঙ্গীতের মত করে ব্যবহার করা। এমনিতে আমরা জানি গানের ক্ষেত্রে একটি কণ্ঠস্বর গানটি গায় এবং তাকে সঙ্গত করার জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রসঙ্গীত বাজে। কিন্তু গান গাওয়ার পাশাপাশি আরেকটি কণ্ঠস্বর যে যন্ত্রসঙ্গীতের মতো বাজতে পারে এ জিনিষ বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সলিল চৌধুরীর আগে সফলভাবে কেউ করে দেখাতে পারেননি।

লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে 'না যেওনা, রজনী এখনো বাকী' গানটি আরেকবার শুনে দেখুন যা বললাম তা ঠিক কিনা। ঐ গানের 'আমি যে তোমারি শুধু জীবনে মরণে' লাইনটি যখনই শুরু হল তখনই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরের প্রয়োগ শুরু হয়। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হল এই যে কোনোভাবেই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর কিন্তু লতার মূল কণ্ঠস্বরকে কপি করে বাজেনি। তিনি একটি স্বতন্ত্র সুরকে মূল কণ্ঠস্বরের সমান্তরালভাবে চালান। এই অংশটি যখন আপনি ক্যাসেট শুনবেন, তখন মনে হবে মনের মধ্যে কি যেন একটা বুঝি হয়ে গেল, যেন একটা অনুভূতির স্রোত বয়ে গেল। ক্যাসেটটি বন্ধ করে ঐ লাইনটিই আপনি আপনার নিজের গলায় গেয়ে দেখুন, দেখবেন সেই effect আসছে না। আসলে এই অংশে দ্বিতীয় মাত্রা যোগ করা হল এবং তাই সেই অর্থের ব্যপ্তি আপনি feel করলেন শারীরিক অনুভূতির মাধ্যমে।

আবার আরেকটি গানের উদাহরণ নিন। এটিও লতা মঙ্গেশকরেরই গাওয়া। গানটির নাম 'অন্তবিহীন, কাটে না আর যেন বিরহের এই দিন'। এটিতেও সলিল কণ্ঠস্বরকে যন্ত্রসঙ্গীত বানালেন, কিন্তু তা অন্য প্রয়োজনে অন্য জায়গায়। আগের গানের মত এই গানেও মূল কণ্ঠের সমান্তরালে সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের যন্ত্রসঙ্গীতের মত করে প্রয়োগ রয়েছে। কিন্তু কথার প্রথম stanza শেষ হবার পর অন্তরা শুরু হবার আগে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাথে সমান্তরালে কণ্ঠস্বরের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। গানের দুটি stanza-র মাঝের এই মধ্যবর্ত্তী যন্ত্রসঙ্গীতকে বলা হয় 'interlude'। তাই এই গানে কণ্ঠসঙ্গীত দিয়ে সলিল interlude রচনা করলেন।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হল প্রথম গানে কণ্ঠস্বরকে মূল কণ্ঠের সমান্তরালে এবং দ্বিতীয় গানে কণ্ঠস্বরকে interlude হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন কি ছিল ? সেখানে কি বাদ্যযন্ত্রের অভাব পড়েছিল বলেই সলিল এমন করলেন ? নাকি শুধুমাত্র শ্রোতাদের এই শারীরিক অনুভূতি তৈরী করার জন্য করলেন?

সঙ্গীত শুনে শ্রোতাদের শারীরিক স্পন্দন তৈরী হওয়া – এটি হল ফল। ফলকে কারণ করে কখনো কোনো সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টি সবসময়েই হয় তার সামাজিক crisis-কে মেটানোর জন্য। তাই এই crisis-ই হল তার কারণ। তাই এবার দেখা যাক গান দুটির ক্ষেত্রে কি সামাজিক crisis তৈরী হয়েছিল যা সলিলকে বাধ্য করল কণ্ঠস্বরের এমন ব্যবহার করতে।

'না যেও না' গানটির বিষয়বস্তু হল **যেতে না দেওয়া**। কে, কাকে যেতে দেবে না ? গানের কথাই বলে দিল 'রাত জাগা পাখি' যেতে দিতে চায়না তার কোন প্রিয়জনকে। তার এই না যেতে দেওয়ার অনুভূতিই সে গানের বাকী কথার মধ্য দিয়ে বলেছে। সেখান থেকেই বোঝা যায় যে এটা যেমন তেমন যাওয়া নয়, এ চিরবিদায় নেওয়া। তা না হলে অর্থাৎ ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে সে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে এত আকুতি মিনতি সাহিত্যকে আপ্তবাক্যে ঠাসা ন্যাকামোর পর্যায়ে নিয়ে যেত। কিন্তু চিরকালীন বিদায়ের কষ্ট ব্যাপক। সামাজিক মানুষই এই ব্যাপক অর্থকে অনুভব করতে পারেন কারণ সামাজিকভাবে বেঁচে থাকতে গেলে এই গভীর আত্মউপলব্ধির প্রয়োজন হয়। যাওয়া ও না যাওয়ার মধ্যে এই প্রবল দ্বন্দ্বই

মানুষের এই সামাজিক বোধের crisis তৈরী করেছে। যখনই ব্যাপারটা ব্যক্তিগত আখ্যান থেকে সামাজিক উপলব্ধির জায়গায় উন্নীত হল তখনই তা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি 'সমষ্টিগত' effect দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এনে দিল। তাই কোরাস বা সম্মিলিত কণ্ঠের ব্যবহার। আবার এই তীব্র দ্বন্দ্বকে ফোটাতে তার ব্যবহার সলিল করলেন মূল কণ্ঠের সমান্তরালে অন্যসুর চালিত করে। যাতে মূলকণ্ঠ সুর ও কথা দিয়ে তার বোধের বর্ণনা দিতে পারে এবং পাশাপাশি কোরাস কণ্ঠ বোধের দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করে দিতে পারে। সঙ্গীতের এইরকম প্রয়োগ শ্রোতাদের মনকে যে কতখানি সংবেদনশীল ও আর্দ্র করে দিতে পারে তা গানটি শুনলেই বোঝা যায়। মানুষ সেই অভিব্যক্তিকে স্বাগত জানান তাঁদের অশ্রু দিয়ে। সব সময়ে হয়ত তাঁরা তা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। কিন্তু অশ্রুর কাছে ব্যাখ্যা ও যুক্তি হার মেনে যায় এই মুহূর্তটায়।

পরের গানে অর্থাৎ 'অন্তবিহীন ...' সলিল কণ্ঠসঙ্গীতকে interlude হিসাবেও ব্যবহার করলেন, আবার মূল কণ্ঠের সমান্তরালে আগের গানের মতো করেও ব্যবহার করলেন। গানটি ভালো করে শুনলেই বোঝা যায় যে পুরো গানটি জুড়েই প্রবল হতাশা বিরাজ করেছে প্রথম থেকে শেষে। গানের কথাই জানাচ্ছে – 'তুমি না আসিলে, ভালো না বাসিলে চিরদিন, তালহীন... বড় শূন্য শূন্য"। খেয়াল করুন 'শূন্য' শব্দটির পরপর তিনবার ব্যবহার। অর্থাৎ কথাই নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে দিল, এককথায় গানের বিষয়বস্তু হল 'শূন্যতা'। এখন এই শূন্যতাকে তো আবহে ধরতে হবে ! তা না হলে কথা তার মজবুত ভিত্তি পাবে কিভাবে !

মনে রাখবেন - গান, সিনেমা বা অন্য যে কোনো শিল্পকর্মে যখন কোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতি-কে আনা হয় খুব সংবেদনশীলভাবে তখন শ্রোতা বা দর্শকের মনের অনুভূতিকেও আবেশ সৃষ্টি করে গান বা সিনেমার সেই চরিত্রের অনুভূতির জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। তা না হলে শ্রোতা বা দর্শককে involved করানো যায়না আর অনুভূতিটিরও যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই গানটিতেও তেমনি শূন্যতার আবেশ তৈরী করা হয়েছে তার interlude-এ। একটি মানুষের জীবনের একাকীত্ব বা শূন্যতা ভালোবাসা পেতে চায়। তাই সে আরেকটি মানুষের উপস্থিতি দাবী করে। এ পরিস্থিতিতে মানবকণ্ঠই অনেকটা চাপাস্বরে পিছনে দীর্ঘ বিরামে বেজে এই দীর্ঘ শূন্যতার অর্থকে সঠিকভাবে সূচিত করতে পারে। এবং অবশ্যই দ্বান্দ্বিকভাবে কারণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যর উপস্থিতিতেই আমরা কোনো জিনিসের সত্যিকারের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি। তাই কোরাস কণ্ঠের বিশেষ ব্যবহার না থাকলে হয়ত শূন্যতা বা একাকীত্বের ব্যাপ্তিই প্রকাশ পেত না।

সলিল চৌধুরীর গানে একই সাথে আলাদা আলাদা স্কেলে কিংবা একই স্কেলে বহু কণ্ঠস্বরের মিশ্রণ এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যও বটে। কিন্তু তিনি সব সময়েই তা করেছেন বিষয়বস্তু ও বোধের দ্বান্দ্বিকভাবে প্রকাশের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে, বাহুল্য প্রকাশের জন্য নয়। শ্যামল মিত্রর কণ্ঠে 'দূর নয় বেশি দূর ঐ' গানটির 'যা গেছে তা যাক' লাইনটিতে, আই পি টি এ-র জন্য রচিত 'ও আলোর পথযাত্রী' গানটিতে এবং মান্না দের কণ্ঠে 'আনন্দ' ফিল্মের গান 'জিন্দেগী, ক্যায়সী হ্যায় পহেলী'-র interlude-এ কোরাস কণ্ঠের ব্যবহার চোখে পড়ার মত। আপনারা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে গানগুলি শুনলেই অনুভূতিগুলো ধরতে পারবেন।

একই সঙ্গে বহু সুরের এইরকম সমান্তরাল ব্যবহার western music-এ আগে থেকেই ছিল। বিখ্যাত western composer মোৎসার্ট এবং বেটোফেন-এর composition-এ সঙ্গীতকে বহুমাত্রিকভাবে ধরার নমুনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যদিও মোৎসার্ট ছিলেন ১৭৫৬-১৭৯১-এই সময়ের মানুষ। এর মধ্যেই তিনি প্রায় ৬০০-র বেশি সুর compose করেছিলেন। বেটোফেনও ছিলেন ঐ সময়কারই (১৭৭০-১৮২১)। বহুসুর একসাথে বাঁধাকে western music -এ harmonization বলে। Western music-এর এই বিশেষ ধারা সলিলকে প্রভাবিত করেছিল। সেই কারণেই হয়ত তিনি তাঁর সুরকেও harmonize করলেন সমান্তরাল অন্য সুরের সাথে একাধিক উপায়ে।

Western music-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল obligato-র ব্যবহার। কি এই obligato ? 'obligato' শব্দটি এসেছে 'obligatory' এই শব্দ থেকে যার মানে 'অতি আবশ্যক'।

বহু সুরকে harmonize করতে হলে মূল সুরের সাথে অনেকগুলো সুরকে একসাথে সমান্তরালভাবে চলতে দিতে হয়। এই অনেক সুরের মধ্যে একটি বিশেষ সুরকে composer-রা বেছে নেন অতিআবশ্যক সুর হিসাবে। অর্থাৎ মূল সুরের পাশাপাশি এই সুরটিকে অতি অবশ্যই বাজতে হবে, কিন্তু ঐ সুরটি বাজবে স্বতন্ত্রভাবে, মূল সুরটিকে অনুকরণ করে নয়।

আবার আরেক দলের মত-যেহেতু মূল সুরের সাথে এই obligato বক্রভাবে বা obliquely বাজে তাই এর নাম obligato। যাই হোক্ না কেন, obligato-র ব্যবহার

Western music-এ থাকলেও আধুনিক বাংলা সঙ্গীতে তা সফলভাবে প্রয়োগ করলেন সলিল চৌধুরী। আগের গানটির কথা মনে করুন, এর নমুনা পেয়ে যাবেন। 'না যেও না' গানে 'আমি যে তোমারি' লাইনেই কণ্ঠ সঙ্গীতের যে বক্রভাবে সমান্তরাল ব্যবহারের কথা আগে আলোচনা করলাম, তা-ই আসলে obligato। সলিল যন্ত্রসঙ্গীতেও এই obligato-র প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। মুকেশের কণ্ঠে 'মনমাতাল সাঁজ সকাল' তারপর লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে 'যা রে, যারে উড়ে যা রে পাখী' গানে আপনারা obligato-র সার্থক ব্যবহার মিলিয়ে দেখতে পারেন। এরকম আরও অজস্র গানের নমুনা রয়েছে সলিল সঙ্গীতে। পরে তা অন্য সঙ্গীতকারেরা ফলো করেছেন।

এরপর আসব Rhythm বা তাল-ছন্দ নিয়ে কাজের ব্যাপারে। সঙ্গীতে তালের ব্যবহার সুরকে একটি ছন্দোবদ্ধতা দেয়। এই ছন্দোবদ্ধতা, সঙ্গীত যাঁরা বোঝেননা বলেন, তাঁরাও বুঝতে পারেন। গানের কথাই ধরুন, কবিতার একটা নিজস্ব ছন্দ থাকে, সেই কবিতাকে সুর দিতে হ'লে কথার ছন্দকে মাথায় রেখে সুরের ছন্দ বা তাল ঠিক করতে হয়। সেই তালকে বাজানোর জন্য বিভিন্ন তাল বাদ্যযন্ত্র আছে যেমন-তবলা, পারকাশন ইত্যাদি। 'পারকাশন' কথাটির মানেই হল Beat বা স্পন্দন।

তবলা যেহেতু ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র, তাই এর ব্যবহার রাগসঙ্গীত থেকে শুরু করে আধুনিক গান সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সলিল চৌধুরীও তাঁর বহু গানে ছন্দোবদ্ধতাকে ধরার জন্য তবলার ব্যবহার করেছেন। তবে প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সঙ্গীতে তবলার এই নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার শ্রোতার মনে একঘেয়েমিও এনে দিয়েছিল। তাছাড়া ভেবে দেখুন, ছন্দেরও তো রকমফের থাকতে পারে। একটি ট্রেন যখন চলে, তার চলার যে স্পন্দন সেটির সাথে কি ঝরণার জলের ঝির্ ঝির্ করে ঝরে পড়ার স্পন্দন এক হতে পারে ? তালের কথা বলছিনা, সেটি তো স্বাভাবিকভাবেই আলাদা হবে। কিন্তু ছন্দের অনুভূতির বৈশিষ্ট্যটাই তো দুই ক্ষেত্রে আলাদা। তাহলে সমস্ত জায়গাতেই যদি তবলার একই আওয়াজ ভিন্ন তালে ব্যবহার করি তাহলে সেই সূক্ষ্ম অনুভূতির পার্থক্যকে Express করা যাবে না।

ঠিক এই প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই হয়ত সলিল বিকল্প রাস্তা খুঁজেছিলেন। আধুনিক বাংলা গানে প্রথাগতভাবে তবলা ব্যবহারের নিয়ম ভেঙ্গে শুরু হল সলিলী প্রথায় পারকাশিভ্ যন্ত্রের ব্যবহার যেমন ড্রামস্, অক্টোপ্যাড ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা গান এক নতুন Sharpness-এর দুনিয়া দেখতে পেল।

সলিল কিন্তু এখানেই থেমে থাকলেন না। তিনি তালকে ধরলেন পিয়ানোয়, গীটারে এবং বিভিন্ন প্রকারের String instrument-এ। সেখানে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই প্রথাগত তালবাদ্যের একটি stroke ও ব্যবহার করলেন না।

লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে 'ও মোর ময়না গো' গানটির বৈশিষ্ট্যই হল শুধুমাত্র গীটার ব্যবহার করে এই গানের পুরো তালটিকে ধরে রাখা।

৫০ দশকের শেষদিকে এবং ৬০ দশকের গোড়ায় সলিল আধুনিক বাংলা গানে একটি নতুন style আনলেন তাঁর একটি অবিস্মরণীয় গানের মধ্য দিয়ে। গানটির নাম 'সুরের এই ঝর ঝর ঝরণা', সবিতা চৌধুরীর কণ্ঠে রেকর্ডেড।

এই গানটিতে সলিল তাল রাখতে বহু String instrument-কে একসাথে প্রয়োগ করলেন ঝংকারের মতন। গানটির বিষয়বস্তু ঝরণা ও তার গতি। ঝরণা বহু জলধারার একত্রিত রূপ যা কোনো সমতল বেয়ে শান্তভাবে বয়ে এসে হঠাৎ করে খাদ পেয়ে দ্রুত প্রবল গতিতে ঝরে পরে। ঝরণার এই গতির বৈশিষ্ট্য তাহলে প্রধানত তিন প্রকার–(১) বহু জলধারার একত্রিত চলন ও ঝরে পরা, (২) গতির Sharpness বা তীক্ষ্ণতা এবং (৩) ভূমিরূপের বৈচিত্র্যের কারণে তার দ্রুত ওঠা-পড়া।

গানের এই ঝরণা কিন্তু সত্যিকারের জলধারার ঝরণা নয়, এ হল সুরের ঝরণা। জলধারার ঝরণা হলে তাতে স্বাভাবিকভাবে তার গতিপথের বর্ণণা, প্রকৃতির বর্ণনা এসমস্ত আসত। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরই লেখা 'ঝরণা' কবিতায় সেসব বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

সলিল ঝরণার নতুন dimension দিলেন তাকে 'সুরের ঝরণা' বানিয়ে। তিনি কথা ও সুরে ঝরণার texture রাখলেন বটে কিন্তু বিষয়বস্তুকে নিয়ে গেলেন এক কাল্পনিক বোধে। এই বোধের কারণেই বর্ণনাধর্মী গল্প রূপান্তরিত হল বিশ্লেষণধর্মী ভাবনায়।

ঝরণার বৈশিষ্ট্যর তৃতীয় বিষয়টিকে অর্থাৎ গতির দ্রুত ওঠা ও নামা বা ওঠা-নামা-কে তিনি সুরে ধরলেন prelude রচনায়। তার পরেই সবিতা চৌধুরীর কণ্ঠে গানের প্রথম শব্দ 'সুরের', কোনো আবহসুর ছাড়াই এই অংশটি আস্তে করে গাওয়া হল। খেয়াল করুন এটি হল ঝরণার সমতল প্রবাহ যেখানে তার গতি মন্থর। তাই সুর ছাড়াই শুধু গলায় অতি আস্তে তা গাওয়া হল। তার পরের অংশ থেকেই উত্তাল গতির আগমন। একসাথে বাজনা এবং সমবেত কণ্ঠ মূলকণ্ঠের পাশাপাশি। এটি ঝরণার গতির প্রথম বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ

একত্রিতভাবে চলা এবং তৃতীয় বৈশিষ্ট্য দ্রুত নামা দুটিকেই একসাথে প্রকাশ করল।

এখানেই তো শেষ নয়। ঝরণার গতির sharpness বা তীব্রতা তো এখনো দেখানো বাকী। তীক্ষ্ণতা গলায় দেখানো যেত। কিন্তু গলার সেই তীক্ষ্ণতা আবার কাল্পনিক বোধের কোমলতাকে বিরোধিতা করত ভাবে ও ভঙ্গিতে। তাই sharpness তিনি আনলেন তাল প্রয়োগে একসাথে বহু string instrument-কে ব্যবহার করে। string-এর শব্দ আবার জলের শব্দের সাথেও খুব মিলে যায়।

সমবেত কণ্ঠকে মূলকণ্ঠের পাশাপাশি রেখে harmonize করার উদাহরণ সলিল তাঁর আগের বহু গানেই দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এই গানে তিনি এক নতুন technique আনলেন। তিনি মূলকণ্ঠ এবং কোরাস কণ্ঠ-র মধ্যে সংলাপ বিনিময় করলেন যা এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি। প্যারডি-ধর্মী গানে সংলাপ বিনিময়ের প্রথা আছে। কিন্তু তা দুটি বিপরীত চরিত্রের মধ্যে। কোরাস কণ্ঠ যা কিনা গানের শুরু থেকেই যন্ত্রসঙ্গীত হিসাবে দ্বিতীয় মাত্রা দিচ্ছিল, তা তৃতীয় মাত্রা পেল সংলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে।

গানটির প্রথম অংশ এবং interlude-এর পর যখন দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ 'অন্তরা' শুরু তখন ঘটল আরেকটি কান্ড। অন্তরার সূচনা তিনি করলেন কোরাস কণ্ঠ দিয়ে যেখানে সবিতা চৌধুরীর মূল কণ্ঠটি তার supplement বা পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে। সূচনায় আমরা যে পরম্পরায় শুনেছিলাম সেটি গেল উল্টে। এই বদল হওয়ার ফলে মূলকণ্ঠের বিরাম হল কিছুক্ষণের জন্য এবং সেটি কোরাসের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হল। শ্রোতার দিক থেকে বিচার করলে শোনার নিয়ম পরিবর্তনের জন্য আকর্ষণ বেড়ে গেল। এটি এক অর্থে গানটির প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর একটি প্রক্রিয়া।

তাল ভাঙ্গার ব্যাপারেও সলিল চৌধুরীর অবদান অনস্বীকার্য। একই তাল ভেঙ্গে নতুন নতুনভাবে হাজির করা এবং তা অবশ্যই সঙ্গীতের প্রয়োজনে–এ বড় আশ্চর্যের। একই গানের ক্ষেত্রে দুটি আলাদা অংশে আলাদা তাল ব্যবহার করেছেন তিনি। কিন্তু ঐ দুটি অংশের বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেগুলির একটির বক্তব্য কারণ হলে অপরটি হয়ত তার ফল, একটি বর্ণনা হলে অপরটি হয়ত তার বিশ্লেষণ। আর শ্রোতার দিক থেকে বিচার করলে সুসংবদ্ধ পরিবর্তন শোনার ইচ্ছাকে বাড়িয়ে তোলে একঘেয়েমি কাটিয়ে। এরফলে মনে হয় যেন সঙ্গীতকার তাঁর এই প্রয়োগ দেখিয়ে বলছেন–এদিক ওদিক মন না দিয়ে গানে ফিরে আসুন।

সলিল চৌধুরী জীবনের শেষদিকে মাঝে মাঝেই নাকি বলতেন তাঁর বুকের ভিতরটা যেন কেমন হুহু করে, কেউ কিছুই বুঝল না তাঁর কাজ ! জনগণের চেতনার সাথে হয়ত তাঁর চেতনার বিস্তর ফারাক ছিল, তাই তাঁর এই আক্ষেপ। কিন্তু এই আক্ষেপ অনেকাংশ মিটে যেত যদি তিনি জনগণের বোধকে উন্নীত করার কাজে লাগতেন। শিল্পের সার্থকতা তখনই হয় যখন ব্যাপক সংখ্যক মানুষ তাকে উপলব্ধি করতে পারে। নিজে ভাবা ও অন্যকে সেই ভাবনা ভাবানো এটাই হল সংস্কৃতি উৎকর্ষতার একমাত্র বৈজ্ঞানিক পথ। তাঁর জীবনে তিনি হয়ত বহু সৃষ্টি করে গেছেন, তবে নতুন শ্রোতা ও স্রষ্টা তৈরীর কাজ অসম্পূর্ণই রেখে গেছেন। তাই শেষবয়সে এসে তিনিও আত্মদ্বন্দ্বে ভুগেছেন।

সলিল চৌধুরী নিজে বাঁশি ছাড়াও বহু বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। তাঁর রচিত বহু সুর তিনি রচনা করার পর না পছন্দ হওয়ার কারণে ছিঁড়ে ফেলেছেন। নিজেও ছিলেন খুব অগোছালো। কিছুই গুছিয়ে রাখতেন না। রেখে দিতেন না অনেক মূল্যবান লেখাও। হারিয়ে ফেলেছিলেন চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে ছবিও। যে ছবিতে চার্লি বেহালা বাজাচ্ছেন, পিয়ানো সঙ্গত করছেন সলিল।(চলবে)

সলিল চৌধুরীর গণ সঙ্গীতের ক্ষেত্র প্রস্তুতে যে মানুষটির অবদান অন্যতম, তিনি হলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। আজ আমরা ২০১২তে পদার্পণ করেছি, কিন্তু আমরা অনেকেই হয়ত জানিনা এ বছরটি আপসহীন সঙ্গীতের সংগ্রামী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম শতবর্ষ। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি এক প্রতিষ্ঠিত জমিদার পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর জমিদারী শান-সওকত-এর প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। মূলতঃ লোক সঙ্গীতকে ভিত্তি করে গণ সঙ্গীত সৃষ্টি করে তিনি আজীবন নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এই মাপের একজন মানুষের সঙ্গীত জীবনকে সম্মান দিতে আসুন আমরা সঙ্গীতকে বঞ্চিত জনগণের মুক্তির পথ রচনায় ব্যবহার করি, যে কাজটি করতে সারাটা জীবন দিয়েছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

রামানুজান স্মরণে

শ্রীনিবাস রামানুজান ১৮৮৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর চেন্নাইয়ের তাঞ্জোর জেলার ইরভেদ শহরের এক গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা কুম্ভকোনাম ছিলেন শহরের একটি কাপড়ের দোকানের হিসাব রক্ষক এবং মা ইরোদ জজ কোর্টের এক কর্মচারীর কন্যা।

পাঁচ বছর বয়সে রামানুজানকে পাড়ার পাঠশালায় এবং সাত বছর বয়সে শহরের টাউন স্কুলে ভর্তি করা হয়। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা স্কুলকর্তৃপক্ষের গোচরে আসে এবং তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বৃত্তি দেওয়া হয়। তিনি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বিভিন্ন গাণিতিক উপপাদ্য, গণিতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি পাই (π) এর মান যেকোনো সংখ্যক দশমিক স্থান পর্যন্ত বলতে পারতেন। তাঁর এক বন্ধু একবার তাকে জি এস কার-এর লেখা 'সিনপসিস অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স' বইটি পড়তে দেন। মূলত এই বইটি পড়েই তাঁর গাণিতিক প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। তিনি এই বইয়ে প্রদত্ত বিভিন্ন গাণিতিক সূত্রগুলির সত্যতা প্রমাণ শুরু করেন। তাঁর কাছে এগুলো ছিল মৌলিক গবেষণার মতো কারণ তাঁর কাছে অন্য কোনো সহায়ক বই ছিল না। তিনি ম্যাজিক স্কোয়ার গঠনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এরপর তিনি জ্যামিতিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর কাজ শুরু করেন। তাঁর বৃত্তের বর্গসম্পর্কীয় গবেষণা পৃথিবীর বিষুবরৈখিক পরিধির দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৬ বছর বয়সে রামানুজান ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও জুনিয়র শুভ্রামানায়াম বৃত্তি লাভ করে কুম্ভকোনাম সরকারী কলেজে ভর্তি হন। গণিতের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার ফলে পরের পরীক্ষায় ইংরাজিতে অকৃতকার্য হন এবং তাঁর বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি কুম্ভকোনাম ত্যাগ করে প্রথমে বিশাখাপট্টম ও পরে চেন্নাই যান। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ফার্স্ট এক্সামিনেশন ইন আর্টস (FA) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং অকৃতকার্য হন। তিনি আর এই পরীক্ষা দেননি। এরপর কয়েক বছর তিনি নিজের মতো গণিত বিষয়ক গবেষণা চালিয়ে যান।

১৯০৯ সালে রামানুজান বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর কোনো স্থায়ী কর্মসংস্থান ছিল না। তাঁর জন্য কোনো বৃত্তি ব্যবস্থা না হওয়ায় এবং রামানুজান দীর্ঘকাল অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে সম্মত না হওয়ায় তিনি মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের অধীনে একটি সামান্য পদের চাকরীতে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁর গবেষণার কাজ এসবের জন্য কখনো ব্যাহত হয়নি। পোর্ট ট্রাস্টে কাজ করার সময় কিছু লোকের সাথে তাঁর পরিচয় হয় যাঁরা তাঁর নোটবুক নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন। ১৯১১ সালে তাঁর প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ 'জার্নাল অফ দ্য ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯১২ সালে একই পত্রিকায় তাঁর আরো দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

মাদ্রাজ শহরের বিশিষ্ট পন্ডিত শেশা আইয়ার এবং অন্যান্যদের পরামর্শে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো জি. এইচ. হার্ডির সাথে রামানুজান যোগাযোগ শুরু করেন এবং তাঁর বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজি ভাষায় একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠির সঙ্গে ১২০ টি উপপাদ্য সংযোজিত ছিল, যার ভিতর থেকে নমুনা স্বরূপ হার্ডি ১৫টি নির্বাচন করেন।

অনেকদিন যাবৎ হার্ডি রামানুজানকে কেমব্রিজে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। রামানুজানের অনেক বন্ধু ও হিতৈষীর চেষ্টায় ১৯১৩ সালের মে মাসে মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের কেরানীর দায়িত্ব থেকে তাঁকে মুক্ত করা হয় এবং একটি বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। ঠিক এমনি সময় তিনি কেমব্রিজ থেকে একটি আমন্ত্রণ পান।

১৯১৭ সালের বসন্তকালে প্রথমে রামানুজান অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে কেমব্রিজের এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। এই সময় তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৯ সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। কিছুকাল যক্ষ্মায় ভোগার পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

রামানুজান জন্মেছিলেন ১৮৮৭ সালে। আজ আমরা ২০১২ সালে পা দিয়েছি। অর্থাৎ রামানুজানের জন্মের আজ ১২৫ বছর। রামানুজান হয়ত ভাল ইংরাজি জানতেন না এবং প্রচলিত সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাতেও এক অর্থে অকৃতকার্য ছিলেন। কিন্তু তিনি আসলে যে কী ছিলেন তা গোটা দুনিয়ার শিক্ষিতের কাছে আজ অজানা নয়। তাই আজ এই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বেড়াজালে পড়ে কতশত রামানুজান প্রস্ফুটিতই হতে পারছে না, তার খবর কি কেউ রাখে? ■

বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা স্মরণে

যাওয়ার আগে রেখে গেলেন

গবেষণার কাজে আত্মনিমগ্ন ব্যক্তিদের আপাত অসামাজিক মনে হলেও তাদের গবেষণার ফল সমাজকে চিরকাল সমৃদ্ধ করেছে। সামাজিক নিয়মে যদিও আবিষ্কারের ফলাফলগুলি সকলে অর্জন করতে পারে না।

২০১১-এর ৯ই নভেম্বর, বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানার জীবিত উপস্থিতির অবসান ঘটেছে। পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব প্রসঙ্গে, জড় বস্তু থেকেই জীবিত বস্তুর সৃষ্টি – এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে, তাঁর গবেষণা মৌলিক অবদান রেখেছে। তাই মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে বজায় রাখার কাজে তিনি সামাজিক।

১৯২২-এর ৯ই নভেম্বর বর্তমান ছত্তিশগড় রাজ্যের রায়পুরে তাঁর জন্ম। গ্রামের স্কুলে গুরুমশাই-এর কাছে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈব-রসায়নে প্রথমে বি এস সি অনার্স ও পরে এম এস সি পাশ করেন। ইংলন্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব দেহের ত্বক ও চুলের রঙ সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫২-১৯৫৯ পর্যায়ে তিনি কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে অবস্থিত, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ রিসার্চ কাউন্সিলে গবেষণারত অবস্থায় কৃত্রিম রাসায়নিক পদ্ধতিতে 'কো-এনজাইম এ' তৈরি করেন। ইনস্টিটিউট অফ এনজাইম রিসার্চ-এ কর্মরত অবস্থায় তিনি কৃত্রিমভাবে আর এন এ এবং ডি এন এ পলিমার তৈরী করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রকৃতিজাত জীবিত কোষগুলির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পদার্থগুলি কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে উদ্যোগী হন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্য পান। এই সাফল্যগুলির সমষ্টিগত ফল হল ২০১১ সালে কৃত্রিমভাবে জীবিত কোষ সৃষ্টি।

১৯৬১ সালে তাঁর রচিত বিখ্যাত বই, "সাম রিসেন্ট ডেভলপমেন্টস্ ইন দি কেমিস্ট্রি অফ ফসফেট ইস্টারস অফ বায়োলজিক্যাল ইন্টারেস্ট" প্রকাশিত হয়।

ড: মার্শাল ডব্লু নিরেনবার্গ ও ড: হোলির সঙ্গে ড: খোরানা রাসায়নিক পদ্ধতিতে ডি এন এ সংশ্লেষ করে জিনের গোপন সাংকেতিক ভাষা বা জেনেটিক কোডের বিন্যাস সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট চিত্র প্রকাশ করেন। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৬৮ সালে ওনারা তিনজন যুক্তভাবে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।

তাঁরা ক্রোমোজোমের মধ্যে, নির্দিষ্ট জিনের নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয় করেন যার ফলে জিন প্ল্যান্টেশন সম্ভব হয়েছে – বংশগত কিছু রোগ নিয়ন্ত্রণ করার উপায় পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক গতিশীলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে, হরগোবিন্দ খোরানার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।■

বিষমদে মানুষের মৃত্যু
'আইনী' ও 'বে-আইনী' মদের বিতর্ক উস্কে দিল!

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট সংলগ্ন এলাকায় বিষমদ পান করে বহু মানুষ মারা গেছেন। মৃতের সংখ্যা সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমের ঘোষণায় বিভিন্ন হলেও তা দুইশত'র কম। কিন্তু ঐ অঞ্চলের মানুষের মতে ঐ সংখ্যা কম বেশী পাঁচশত।

মৃতদেহগুলির ময়না তদন্তে জানা গেছে, মৃতদের পেটে মিথাইল অ্যালকোহল ছিল – যা মৃত্যুর কারণ। আবগারি দপ্তরের এক কর্তা বলেন, চোলাই এর সঙ্গে মিথাইল অ্যালকোহল – ভেজাল মেশানো বন্ধ করতে, মিথাইল অ্যালকোহলে নীল রং মেশানো হচ্ছে। আবগারি দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, সম্প্রতি এ রাজ্যে চোলাই ও দেশী মদের বিক্রি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। গত নভেম্বর মাসে শুধু দেশী মদের বিক্রি বেড়েছে ৩০%। চোলাই মদ বে-আইনী বলে তার হিসাব পাওয়া যায় না। তাদের মতে গত অক্টোবর মাস থেকে বিদেশী মদের উপর কর বসানোর ফলেই, বিদেশী মদের ক্রেতাদের একটা অংশ দেশী ও চোলাই মদের বাজার বৃদ্ধি করেছে। দেশী মদ সরকার অনুমোদিত আর চোলাই মদ বে-আইনী। তাঁদের মতে নিম্নবিত্ত ও অতি নিম্নবিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দেশী মদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকার পর্যাপ্ত সংখ্যক দোকান খোলার অনুমতি দেয়নি। গোটা রাজ্যে সরকার অনুমোদিত মদের দোকান সংখ্যা মাত্র ১২০৯টি।

দেশী মদ তৈরী হয় শর্করা জাতীয় বিভিন্ন খাদ্যকে ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত করে। আর চোলাই মদ তৈরী করা হয় চিটে গুড় বা চিনির গাদকে ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত করে। চোলাই মদে নেশার মাত্রা বাড়ানোর জন্য যোগ করা হয় কখনো মিথাইল অ্যালকোহল, কখনো থাইমেড, আবার কখনো বা অন্য কোন কীটনাশক। চিকিৎসকদের মতে, মিথাইল অ্যালকোহলের অন্ততঃ ১০ মিলি শরীরে প্রবেশ করলেই পানকারী অন্ধ হয়ে যাবে। আর শরীরে ৩০ মিলি প্রবেশ করলে মৃত্যু অনিবার্য। ঐ চোলাই মদের নমুনা পরীক্ষা করে ফরেনসিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে তাতে ৬০% মিথাইল অ্যালকোহল ছিল। মিথাইল অ্যালকোহল পরিপাকতন্ত্রে প্রথমে ফরম্যালডিহাইডে এবং পরে ফরমিক অ্যাসিডে পরিণত হয় – যার বিষক্রিয়ায় কোষে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায় – এই অবস্থা হাইপক্সিয়া নামে পরিচিত। জনৈক চিকিৎসকের মতে, "চোলাইয়ে মিথাইল অ্যাকোহল ও ইথাইল অ্যালকোহল মিশে যাওয়ার ফলে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং ফুসফুস বিকল হয়ে যায়।" চিকিৎসকদের আশঙ্কা বিষমদ খেয়ে যাঁরা অসুস্থ হলেন তাঁরা মারা না গেলেও চিরকালের মত অন্ধ হয়ে যেতে পারেন। কয়েক বছর আগে, বিষমদ খেয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের হোগলবেড়িয়া গ্রামের নন্দ জানা – তারই উদাহরণ।

চোলাই মদের আসক্তিকে, 'সামাজিক ব্যাধি' রূপে অভিহিত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পুরোটাই বে-আইনী, আইনী করলে সরকারের হাতে টাকা আসবে। কিন্তু তাতে সমাজের সঙ্গে বেইমানী করা হবে। তাই সকলের সাহায্য নিয়ে এগুলি ভাঙ্গতে চাই। ... এক সঙ্গে ভাঙ্গতে গেলে দাঙ্গা হবে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষও হতে পারে।"

পূর্বতন সরকারের আমলে এবং বর্তমান পরিবর্তনের স্রোতে সকল সামাজিক ব্যাধির পুনরাবৃত্তির ন্যায় চোলাই মদের বিষক্রিয়ায় বহু মানুষের মৃত্যু কোনও নতুন ঘটনা নয়। এই চোলাই উৎপাদকের বাজার বড় ছিল, তাই ক্ষতিগ্রস্থ ক্রেতার সংখ্যাও বেশী। কিন্তু যা অভিনব তা হল, মৃতদের পরিবারকে রাজ্য সরকার ২ লক্ষ টাকা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদ ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার কথা ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার ফলেই কবর থেকে বহু মৃতদেহ তুলে, ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

এই ক্ষতিপূরণ কি, "বে-আইনী"কে "আইনী" স্বীকৃতি দান!

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ মাধ্যম, চোলাই ব্যবসার পরিসংখ্যান, চোলাই খেয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের পরিসংখ্যান, পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্তাদের নিয়মিত কর্তব্যের গাফিলতি এবং লাইসেন্সধারী দেশী মদ-এর দোকান সংখ্যার সীমিতকরণ ইত্যাদি বক্তব্য সামনে হাজির করে কি বলতে চাইছে? 'সরকারকে পয়সা দাও আর মদ খাও' – তাই কি?

চোলাই মদে, মিথাইল অ্যালকোহল, থাইমেড ইত্যাদির মতন ভেজালগুলি মেশানোর জন্যই নেশা জোরাল হয়। এই ভেজালগুলির পরিমাণ মারণমাত্রার নীচে থাকলে স্লো পয়জনিং ঘটে – যাতে ধীরে ধীরে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দায় চোলাই উৎপাদকের উপর পড়ে না। সমাজের রক্ষকদেরও দায় থাকে না।

এই ঘটনায় সরকারপক্ষ বিরোধীপক্ষকে দোষারোপ এবং বিরোধীপক্ষ সর্বদলীয় বৈঠক ওয়াক আউট করার মধ্য দিয়ে পরস্পরের "প্রতিলিপি" চরিত্রকে জনসাধারণের সামনে আড়াল করার এবং নিজ নিজ দলীয় কর্মীদের পৃথক স্বত্তা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে, কেননা বিপদের সময় শ্রমজীবী মানুষকে বিভক্ত করে রাখা যাচ্ছে না। আর শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য সরকার ও বিরোধীপক্ষ উভয়ের জন্যই বিপদ।

বাজারী বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের মতে, চোলাই খাওয়ার অভ্যাস ব্যক্তিগত স্বভাব ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "কে, কী খাবে তা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সরকার সেখানে নাক গলাতে পারে না।"

সত্যি কথাই কে কী খাবে, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ব্যক্তিগত ব্যাপারটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই নির্ভর করে ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থার উপর – যা সমাজ অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন এন জি ও এবং সচেতনতা বৃদ্ধিকারী সংগঠনগুলির মদ বিরোধী প্রচার-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মদ্যপান করা ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধিই পেয়েছে। এই প্রচার আন্দোলনগুলিতে সমাজ সচেতনতা ব্যাতিরেকে ব্যক্তিগত সচেতনতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। সমাজ-অর্থনীতির পরিবর্তন না করে, সামাজিক-সংস্কৃতির পরিবর্তন করা যায় না। যাকে "সামাজিক ব্যাধি" বলা হয়েছে তা সমাজ সংস্কৃতির অংশ। ছত্তিশগড়ে শঙ্কর গুহ নিয়োগীর প্রচেষ্টার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলও – এর ব্যতিক্রম নয়।

চোলাই মদের বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর ঘটনা জেনেও, গরীব মানুষ চোলাই মদ খায়। কিন্তু কেন খায়?

কম পয়সায়, চোলাই মদের মারাত্মক নেশা বাস্তবে 'নেই রাজ্যে'র মধ্যেই তাকে বাদশা বানিয়ে দেয়। চির অভাবে, অভাব বোধটাই যেখানে শূন্য হয়ে যায় সেখানে এই বাদশা হওয়ার কড়িটা তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থাকে নতুন করে আরো করুণ করার ঘটনাকে অনুভব করায় না। আবগারি দপ্তরের এক কর্তার মতে, "বে-আইনী চোলাই মদ কখনোই দেশী মদের বিকল্প হতে পারে না। ...

... দেশী মদের দোকান বাড়াতে হবে। সরকারী আয়ের দিক থেকে এবক্তব্য সঠিক হলেও, অতিনিম্নবিত্ত পরিবারের কাছে, চোলাই মদের বিকল্প দেশী মদ হতে পারে না। তাই এই অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষক সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ সকলেই,

"আইনী মদেরও বন্ধু, বেআইনী মদেরও বন্ধু
হরি হে দীনবন্ধু" –■

বিনীতাদের আত্মত্যাগ কবে যথার্থ মূল্য পাবে ?

এ সমাজে যার পয়সা আছে, তারই সবকিছু পাওয়ার অধিকার আছে, অর্থাৎ যার কেনার ক্ষমতা আছে সে কিনে খাবে - পড়বে – স্বাস্থ্য রক্ষা করবে, বিনোদন করবে ... সবই করবে। কিন্তু জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান এতটাই যা মাপার কোন যন্ত্রও নেই, এককও নেই। শুধু অনুভব করা যায়। তাই জীবিত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য জেনেও – মৃত্যু মানুষ কামনা করে না। জীবনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতে, মৃত্যুকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখে চিকিৎসা। এ সমাজে যে যত দামী চিকিৎসা কিনতে পারবে, তার জীবন তত দীর্ঘ হবে। একথা সবাই জানে। কিন্তু গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যারা দামী চিকিৎসা পাবার জন্য দামী টিকিট কিনে, ঢাকুরিয়ার আমরি হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলেন, তারা বা তাদের পরিবার কি জানত যে, তারা মৃত্যু এক্সপ্রেসের টিকিট কেটেছেন! কয়েক বছর আগে, মনিকাঞ্চনের পরিবারও তা জানত না। জানতে পারে না আরও অনেক সময়, আরও অনেকেই। সকলেই জেনেছে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে। কিন্তু এবার মৃত্যু যাত্রীর সংখ্যা এক সঙ্গে এত বেশী যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বোরে থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সকলকেই ঢাল-তলোয়ার নিয়ে মাঠে নামতে হয়েছে। চিকিৎসা পরিষেবার এই নগ্নরূপ রাজনীতির বহুরঙীয় প্রলেপ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা, মোমের আলোতেও ফিকে হয়ে যায় নি। প্রতিদিনই একাধিক হসপিটালে বেঁচে থাকার যোগ্য, একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে – সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর দিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে যায় ঐ ব্যক্তিদের পরিবারগুলি।

চিকিৎসা যখন ব্যবসা – তখন এটাই স্বাভাবিক। কারণ, 'বিজনেস ইস অলওয়েজ রুথলেস'। আর ক্রেতাসুরক্ষা আইনগুলি এই ব্যবসায়ীরাই বানিয়েছে – তাদের স্বার্থে, ক্রেতাদের স্বার্থে নয়। তাই তো এই আইনের সর্বোচ্চ সাজা 'মরণোত্তর ফাঁসি'।

ঢাকুরিয়ার, আমরির দুই কেরালিয়ান নার্স, বিনীতা পিটি ও রামিয়া রাজানও নিজেদের জীবন দিয়ে গেল, হসপিটালের রোগীদের বাঁচাতে। হসপিটালের পাশের পঞ্চাননতলার বস্তির বাসিন্দারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার কার্যে নিজেদের নিয়োগ করেছিল কোন স্বার্থে? নির্দ্বিধায় বলা যায় মানবিক স্বার্থে, কোন ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়।

১২ই ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার পাঁচ নং পাতায় "লক আপের রুটি ডালেই লাঞ্চ আমরি কর্তাদের" সংবাদ শিরোনাম – যে শিশু ভোলানোর চেষ্টা করেছে – তা সকলেই বোঝেন।

কিন্তু বিনীতা পিটি, রামিয়া রাজন এবং পঞ্চাননতলা বাসীদের এর আত্মত্যাগকে পর্দা করে তার আড়ালে কারা লুকিয়ে থাকবে – তাদের হিংস্র দাঁত – নখ নিয়ে ? এই মানবিক আত্মত্যাগগুলির আন্তরিক মূল্য সেদিনই সম্ভব যেদিন চিকিৎসা একটি সামাজিক অধিকার হবে, ব্যবসায়িক অধিকার নয়।■

পাঠকের কলম

সাঁতারু বাঘ

পূর্ণিমা নস্কর

ভারতের বাঘের সন্তরণ নিয়ে খুব একটা কেউ মাথা ঘামায় না। অতীতে ১৭৬১ সালে মুম্বাইয়ের সল সেট্টি দ্বীপে কয়েকটা বাঘ থান খাঁড়ি সাঁতরে পাড়ি দিয়েছিল, ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে আর একটা বাঘ সাত মাইল সাঁতরে মাজাগাঁওতে চলে এসেছিল। বাঘ শিকার ধরার জন্য জলে নামে। কিন্তু সুন্দরবনে জলকাদা ও জঙ্গলে লড়াই করে বাঁচার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে বাঘের চেহারা অন্যরকম। অন্যান্য বাঘের তুলনায় সুন্দর বনের বাঘেরা ব্যতিক্রমী ও লড়াকু ও খানিকটা জলচর ও খানিকটা উভচর জীবন যাপন করে। অন্যত্র বাঘেরা যেখানে শরীর ঠান্ডা করার জন্য জলাশয়ে নামে সেখানে সুন্দর বনে বাঘের জলে নামাটা অভিযোজন ও অভূতপূর্ব। তাদের প্রায়ই খাঁড়ি বা নদীতে সাঁতার কাটতে দেখা যায় প্রাকৃতিক শর্ত

অনুযায়ী প্রয়োজনে দীর্ঘ জলপথ দ্রুত সাঁতরে পার হওয়ার ক্ষমতা অর্জনের জন্য।

বাঘের সাঁতার কাটাটা বেশ মজার, কান পিছনের দিকে টানটান করে সামনের পাদুটো লম্বা করে এগিয়ে দুচোখ খোলা রেখে পিছনের পা দুটো টানটান করে বাঘ ডাঙা থেকে লাফ দিয়ে সপাটে জলে ঝাঁপ দেয় দক্ষ সাঁতারুর মত। শুধু মুখটা জলের ওপর উঁচু করে ভাসিয়ে রেখে দিব্যি সাঁতরাতে থাকে। কানে যাতে জল না ঢোকে তাই মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে জল ঝাড়ে। সাঁতার কাটার সুবিধার জন্য বাঘের পায়ের পাতা বিবর্তনের যুগে খানিকটা বাঁকানো হয়ে গেছে, যার ফলে তারা তা ফ্লিপারের মত ব্যবহার করতে পারে। সুমাত্রার বাঘেরও এই শারীরিক সুবিধা রয়েছে। তাই বাঘ ডাঙার প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাঁতারু। বাঘেরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে ডুব দিয়ে জলের তলায় চলে যেতে পারে। জল থেকে ডাঙায় উঠে বাঘ ভাল করে গা ঝাড়া দেয়। যাতে লোম গায়ে লেপটে না থাকে। জলের স্রোতের টান সম্পর্কেও তাদের 'ষষ্ঠেন্দ্রিয়' কাজ করে। এরা স্রোতের সঙ্গে সমকোণ করে সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত, তা স্রোত যতই শক্তিশালী হোক না কেন। অনুকূল স্রোতে তারা গা ভাসিয়ে দেয়, অযথা শক্তিক্ষয় করে না। আর প্রতিকূলে সাঁতরায়।

২৫শে মে ২০০৯ সুন্দরবনে আয়লার তিনদিন ব্যাপী তাণ্ডবে যখন ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে ঝড় আছড়ে পড়ল, বন ও মানুষের ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর হলেও মরা বাঘের কোনও সংবাদ মেলেনি। হতে পারে 'ষষ্ঠেন্দ্রিয়' বাঘকে আগে জানিয়ে দিয়েছিল যার ফলে আগেই হয়তো তারা উঁচু জায়গায় উঠে গিয়ে থাকবে। এমন ঘটনা প্রকৃতি নির্ভর অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও ঘটে।

সাধারণত মাঝরাতের অন্ধকারে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন মানুষখেঁকো বাঘ সাঁতরে চুপিসারে নোঙর করা বোটে লাফিয়ে উঠে নিঃশব্দে তার শিকার মুখে করে নিয়ে পালায়। বাঘের এই ওঠানামার সময় নৌকা শুধু একটু দুলে ওঠে। নৌকার অন্য অরোহীরা টের পায় না যে, কি ঘটে গেল। মৌলি, মৎসজীবী যারা সম্পদ সংগ্রহ করতে জঙ্গলে ঢোকে, রাতে জলেই ক্যাম্প করে থাকতে হয় – তারাই বেশিরভাগ সময় বাঘের শিকার হয়, তবে এটা বেশি ঘটে ভাঁটার সময়।

আবার বাঘ হয়তো কোন হরিণ এর দলকে তাড়া করে জলে নামল, কিন্তু কুমিরের মুখে পড়ল তখন কুমিরের ভয়ে শিকার ছেড়ে দিয়েই ডাঙায় উঠে আসে। এবং বাঘ যতবারই শিকারটা ধরার জন্য জলে নামে ততবারই কুমীর তাকে তাড়া করে, হয়তো শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টার পর সে মরা হরিণটাকে জল থেকে ওপরে তুলতে পারে।

অনেক সময় রানি বাঘ আবার ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখায়। দেখা যায় সাঁতরাতে সাঁতরাতে বাঘ বোটের অনেক কাছে চলে এসেছে, তখন বাঘ সাঁতার থামিয়ে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকায়, আর এইভাবেই প্রায় দু-তিন মিনিট চুপচাপ থাকে। কিন্তু সে যে ভয় পেয়েছে সেটা মোটেই বোঝায় না। পরিস্থিতিটা কি সেটা বুঝতে চেষ্টা করে, তারপর তার রাজত্বে অনধিকার প্রবেশকরীরা বিরক্তিকর হলেও শত্রু নয় সেটা বুঝেতে পেরে ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখিয়ে আবার সাঁতরাতে আরম্ভ করে এবং খুব দ্রুত সাঁতরে জঙ্গলে মিলিয়ে যায়।

ভাগ্য খুব ভালো হলে সুন্দরবন ভ্রমণকারীদের বাঘের এই বিরল সাঁতারের দৃশ্য চোখে পড়তে পারে। সুন্দরবনে সজনেখালি, দোবাঁকি, নেতিধোপানি, বুড়িরডাবরি, সুধন্যখালি যাবার পথে বাঘের নদী পারাপার দেখা যেতে পারে। ■

ছাত্রসমাজ ও ইন্টারনেট

সমীরণ মল্লিক

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ নিজের সাথে লড়াই করে সভ্যতার বিবর্তনের হাত ধরে চলতে চলতে নানা সমস্যার সম্মুখিন হয়েছে এবং সেগুলিকে অতিক্রম করেছে নানা সৃষ্টির মাধ্যমে। যার ফলে আমরা আজ এত উন্নতির শিখরে এসে পৌঁছেছি। প্রত্যেক কারণের পিছনে লুকিয়ে আছে বিজ্ঞান কিন্তু বিজ্ঞান কি শুধু মানব সভ্যতাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, নাকি বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে মানুষ হিংস্র হয়ে ওঠে? বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হল "ইন্টারনেট"। এই শব্দটার সাথে বর্তমানে আট থেকে আশি সমস্ত বয়সের মানুষরাই পরিচিত। ইন্টারনেট কথার অর্থ হল জাল বিন্যাস অর্থাৎ যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বটাকে জাল দ্বারা ঘিরে ফেলা যায়। কিন্তু এই জাল দিয়ে ঘিরে ফেলার মধ্যে

আমরা কি নিজেরা এক কলুষিত নাগপাশে বন্দী হচ্ছি না?

ইন্টারনেট একদিকে যেমন সমগ্র বিশ্বকে এক মুহূর্তের মধ্যে কম্পিউটারের সামনে তুলে ধরছে, তেমনভাবে অতি সহজেই সমস্ত পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। ইন্টানেটের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের নানা তথ্য অতি সহজেই পাই আবার বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তির কাজেও এর ব্যবহার অনস্বীকার্য। কিন্তু এর বিপরীত প্রভাব আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাই। আমরা সবাই হয়তো জানি যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছাত্ররা বিভিন্ন কুরুচিকর জিনিসের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। আর এর ফলে বহু ছাত্র তাদের ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলী দিচ্ছে। এর দায় কি শুধুমাত্র এই ছাত্রদের? যদি বলি হ্যাঁ তবে সেটা মোটেও যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণটা আমাদের ভাবতে হবে। ছাত্ররাই যদি ভবিষ্যতের মূল কাঠামো, দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে, তবে সরকারের কি উচিত নয় এ বিষয় লক্ষ্য রাখা যাতে ছাত্ররা কু-প্রভাবে প্রভাবিত না হয়। তাই যদি সরকার করত, তাহলে ইন্টারনেটে বিভিন্ন অশ্লীল ওয়েবসাইটগুলির অস্তিত্ব টিকে আছে কিভাবে? এখন যদি বলা হয় যে সমাজে কিছু বাজে থাকলেই তুমি বাজে হবে! সমাজের ভাল-মন্দ বিচারের দায় যদি রাষ্ট্রের থাকে তবে সুস্থ সমাজ গড়ার দায়ও সরকারের।

ছাত্রসমাজের এই ইন্টারনেট দ্বারা আকৃষ্ট হবার পিছনে আর একটি কারণ হল তাদের উপর থাকা মানসিক চাপ। ছোটবেলা থেকে বাবা-মা বলে আসেন যে পরীক্ষায় প্রথম হও, ভালো রেজাল্ট কর, ভালো জায়গায় চাকরী কর ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কখনো সেই শিশুকে ভালোবেসে একবারও জিজ্ঞাসা করা হয় না যে, "বাবু তুই কি হতে চাস? তোর কি ভালো লাগে?" এই পড়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে উৎসাহ তৈরী করতে ব্যর্থ বর্তমান শিক্ষকরা। কী করে পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর আনা যাবে সেই ব্যাপারে শুধু বলা হয় কিন্তু বিষয়টাকে ভালবেসে পড়া বা শেখা বা জানার জন্য পড়ানো হয় না, ছেলেমেয়েদের থেকে তাদের ব্যাগের বোঝা বেশী হয়। তাদের মধ্যে এমন চাপের সৃষ্টি করা হয় যে তারা এক মুহূর্ত খেলা তো দূরের কথা বসারও সময় পায় না। আর একটু বড়ো হলেই তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয় মোবাইল। তখন পড়তে যেতে যেতে বা অন্য সময় তারা নিজেদের ক্লান্তি দূর করতে চায় মোবাইলের মাধ্যমে। মোবাইলের মাধ্যমে হয় এস এম এস বা ইন্টারনেট-এ ফেসবুক বা অরকুট বা নেট ঘাঁটা। আর এই নেট ঘাঁটার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কুরুচিকর সাইটের মুখোমুখি হয়। বর্তমান ছাত্রসমাজের কাছে আর একটি চিন্তার বিষয় হল কাজ, আধুনিক বাজারে প্রতিযোগিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে চাকরী পাওয়া দুঃসাধ্য। আর এখানে ব্যর্থ হলে এই ছাত্ররা তাদের দুঃখ কষ্ট মেটাবার জন্য বেছে নেয় এই প্রকার কুরুচিকর বস্তু, নেশা ইত্যাদি।

তাই ছাত্রদের মূল দোষ নয়, দোষ সমাজের। যদি সমাজ থেকে সত্যিই এই প্রকার মনোভাব বা সংস্কৃতিকে দূর করা যায় এবং তার সাথে সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষদের ত্যাগ করা বা ঠিক করা যায় তবেই আমরা এক সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব। যাতে থাকবে না কোনও হিংসা, কোনও স্বার্থপরতা।■

বিজ্ঞান মনস্ক গ্রামে বা শহরে গণসচেতনতা বৃদ্ধিকারী অনুষ্ঠান করে থাকে। আপনার এলাকায় কুসংস্কার বা সামাজিক অন্যায়ের ঘটনা ঘটলে আমরা তার স্বরূপ উদ্ঘাটন, অন্যায় দূর করার কাজে সহযোগিতা করে থাকি।

যোগাযোগের ঠিকানা

নন্দা মুখার্জী ঃ ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা,
কলিকাতা - ৭০০০৬৩,
ফোন - ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫
Email : samikshan2009@gmail.com

পরিচয়

– সব্যসাচী

সে হল অনামিকা। হ্যাঁ, নাম না জানা অনামিকা।

বয়স তার কত!

হ্যাঁ, যুবতী তো বটেই।

দেখতে সে কেমন!

ক্লান্তি আর নিস্পৃহতার সংমিশ্রণে যেমন হয়।

অনামিকা ধর্মতলা থেকে একটা মিনিবাসে উঠেছে। বাসের একেবারে পিছনে জানলার পাশের সিটের ঠিক পরের সিটটা যেন তার অপেক্ষায় খালি ছিল। সাধারণ যাত্রী হিসাবে অনামিকা কর্তব্যপালনে ভুল করেনি। জানলার দিকে, অনামিকার পাশে বসে আছে অনীক। দুই অপরিচিত নর-নারীর মধ্যে যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা দরকার, সে বিষয়ে হয়তো মেয়েরা একটু বেশী সচেতন হয়। প্রাথমিকভাবে অনামিকাও তাই। বাস চলছে, জানলার বাইরের পট পরিবর্তন হচ্ছে – তবে তা অপরিচিত নয়। জানলার পাশে বসার সুবাদে অনীক সেই পরিচিত চিত্রের পুণঃ অনুশীলনে সময় কাটাচ্ছে। এরই মধ্যে একটা মৃদু শব্দ – যা দু-ফুট দূরের কারোর পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। কিন্তু শব্দের কারণ অনেকের চোখেই ধরা পড়েছে। মৃদু শব্দ শেষ হওয়ার আগেই, সমবেত – সঙ্গীতের মত – মিশ্র হাসির শব্দে সকলেরই দর্শনীয় বস্তু হয়ে ওঠে অনামিকা। অনীকও বুঝেছে অনামিকার কপালটা সামনে সীট-এর পিছনের রডে ঠুকে গেছে – আর তাতেই সবকিছু।

অনামিকার ক্লান্ত চোখ দুটিকে কে যেন ভিতর থেকে খোলার অনুমতি দিচ্ছে না। চোখ দুটিকে খুলে রাখার প্রচেষ্টায় সে বারে বারে পরাজিত হচ্ছে। যাত্রীদের ব্যাঙ্গাত্মক মুখশ্রী আর বাঁকা চাউনির বিষ মাখানো তীর অনামিকার প্রায় বোজা চোখ দুটোতে ধরা পড়েও – ধরা পড়েনি। কখন যে তার চোখ দুটো বুজে গেছে আর কপালটা অনীকের বাহুতে আশ্রয় নিয়েছে তা সে জানে না। অনীক জানে। বাসের বহু যাত্রী জানে, যারা জানে না তারাও জানছে। অনীকের চোখ দুটো এখন আর জানলার বাইরে কি হচ্ছে জানে না – জানে বাসের ভিতরে পৃথিবীর "বনসাই" এর খবর। জোড়ায় জোড়ায় চোখ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর মত কড়া প্রহরায় – যেন সামাজিক বিধি লঙ্ঘনের দন্ডাদেশের এক রত্তি লঘুকরণ না ঘটে। প্রতিপক্ষে শুধু এক জোড়া চোখ, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের প্রতি জোড়া চোখের সঙ্গে, 'হুঁশিয়ারী' বিনিময় করছে। এই 'হুঁশিয়ারী' শুধু অনামিকার জন্য নয়, অনামিকাদের জন্য, অনামিকাদের সঙ্গে নিয়ে – অনামিকাদের দ্বারা।

অনীকের চোখের এই 'হুঁশিয়ারী' অনামিকা টের পায় নি। অনীক জানে এবং মানে, মানব সমাজের অর্ধেক আকাশ নারী আর অর্ধেক পুরুষ। সংখ্যায় নয়, অধিকারে – দাসত্বে নয় – বন্ধুত্বে। অনীক-এর কাছে নারী – মা, বোন, মেয়ে, বান্ধবী, প্রেমিকা, স্ত্রী সবরূপেই বিদ্যমান – কিন্তু কখনোই ভোগ্য বস্তু রূপে নয়। তাই তো অনীকের দুটো চোখের তীক্ষ্ণতায় ও তীব্রতায় "বনসাই" পৃথিবীটা নীরব-নিরুত্তর।

অনীক জানে, যদি কোনও চূড়ান্ত নোংরা কাজেও অনামিকা রাত জাগে, তাতে সঙ্গ দেয় অন্য অনীকরা। ঘর না বাধা অনামিকারা রাত জাগে, রাতের অনীকদের জন্য। আর রাতের অনীকরা জন্ম নেয়, "রাত – ভোর না হওয়া" সমাজে।

অনীকের গন্তব্যস্থল আসার আগেই, অনামিকার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সকলেই নীরব। যুদ্ধ সমাপ্ত। গন্তব্য স্থলে অনীক বাস থেকে নেমে পড়ে। অনামিকার কাছে অনীকের পরিচয় কি, তা বোধ করি অনামিকাই সবচেয়ে ভালো উপলব্ধি করেছে। কিন্তু এই অনীকের "গন্তব্য স্থল" কোথায়! ■

কবিতা

কাউন্ট ডাউন

–সাহানা

দশ –
এ দুনিয়াটা আমার বস্,
ওরা খাটে আমি খাই
ওদের ঘামে আমি নাহাই ॥

নয় –
জয় জনগণের জয়,
প্রভু নাচায় আমি নাচি
জনগণের সেবায় বাঁচি ॥

আট –
শক্ত করে বাঁধ খাট,
খুড়োর গোলায় ধানের ঢল
তবু গেলে ফলিডল।

সাত –
মা কখন দেবে ভাত ?
হাড়ি চড়াও না কেন রোজ
খিদেয় বোজে আমার চোখ ॥

ছয় –
ছাড়ি লাজ আর ভয়,
পোড়া পেট পালতে
এ পথে হলো যে নামতে ॥

পাঁচ –
পরেছি রঙিন কাঁচ,
সিগারেট আর গেলাস হাতে
আমার মতো, আমায় দাও থাকতে ॥

চার –
সইতে নারি আর,
ঝোলাও তালা যতবার
শক্ত তত মজ্জা-হাড় ॥

তিন –
শুনি কার বিন্,
প্রাণে লাগে যে দোলা
এবার বুঝি দিন বদলের পালা ॥

দুই –
ওদের বোঝা থুই,
কলম ধরি সবার তরে
বিকাবো না, যতই দাও ভরে

এক –
চোখ মেলে দেখ,
ভাইয়ের হাতে মশাল
জ্বাল সব কিছু জ্বাল ॥

ব্যুম্ –
আচমকা কেড়ে ঘুম
দুয়ারে সে যে দাঁড়ায়ে
ডেকে নে হাত বাড়ায়ে।

চালচিত্র

– শ্রীময়ী

রিং... রিং... রিং...

- হ্যালো ঠাকুরপুকুর থানা।

- হ্যাঁ...লো হ্যালো...ঠাকুর পুকুর থানা ?

- হ্যাঁ বলছি, বলুন কি ব্যাপার ?

- অফিসার, আমি... আমি সুনীল বসু। আমি আমি...

- হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন –

- আমি আজ আমার স্ত্রীকে খুন করেছি।

- অ্যাঁ, ইয়ে মানে আপনি কোথা থেকে বলছেন ?

- আমি ফিফটিন ভট্টাচার্যি পাড়া থেকে বলছি।

- আচ্ছা আচ্ছা আপনি ওখানেই থাকুন, আমরা এখুনি আসছি।

-হ্যাঁ অফিসার, আপনি নিশ্চিন্ত ভাবেই আসুন। আমি আমার স্ত্রীর পাশেই আছি।

- রিং রিং ... রিং

- দরজা খোলাই আছে অফিসার, ভিতরে আসুন।

- আপনি সুনীল বসু ?

- হ্যাঁ, আমিই।

- ইনিই আপনার স্ত্রী ?

- দীপ্তি বসু।

- বয়স ?

-আমার ৮৬, আর ওঁর ৭৯।

- কিভাবে এ সব হলো ?

- অনেকদিন পর আজ ও বড়ো শান্তিতে চোখ বুজে আছে। সিভিয়ার রিউম্যাটিক আর্থারাইটিস্ যন্ত্রণায় হাত-পা কুঁকড়ে যায়...ভীষণ কষ্ট... ভীষণ যন্ত্রণা... ওর , ওর যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। আমিও বয়সের ভারে আজ জর্জরিত... কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই। ও আমার হাত ধরে কাতর অনুরোধ করলো 'আমায় মুক্তি দাও"। ওর অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। দেখুন এখন ওর চোখে-মুখে কি শান্তি।

- আপনাদের ছেলে-মেয়ে কেউ আছে ?

- হ্যাঁ, দুই মেয়ে, এক ছেলে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে–দিল্লি আর কানপুরে। ছেলে জার্মানিতে কর্মরত। সবাই উচ্চশিক্ষিত, বড় বড় পোস্টে, বিশাল দায়িত্বে।

তাইতো বাবা-মা আজ...

- আমি দুঃখিত মিঃ বসু। আমাকে আমার কাজ করতে হবে।

- হ্যাঁ, হ্যাঁ চলুন অফিসার। আচ্ছা একটু দাঁড়াবেন। ওর মুখের ওপর চুলগুলো পড়ে আছে, একটু সরিয়ে দি –

***

রিং... রিং... রিং...

- হ্যালো রিজেন্ট পার্ক থানা বলছি।

- হ্যালো আমি শর্মিলা কর, ২২ নং এস. সি. বোস লেন থেকে বলছি। আমার পাশের বাড়ির যে বৃদ্ধা মাসিমা, মানে সুজাতা মুখার্জীকে গত পাঁচ-ছ' দিন ধরে বাড়ির বাইরে আর দেখতে পাচ্ছি না। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। গতকাল থেকে একটা পচাঁ গন্ধ বের হচ্ছে। আপনারা যত তাড়াতাড়ি এসে ব্যাপারটা একটু দেখুন।

- এক্ষুনি আসছি। এর মধ্যে যেন কেউ কোন কিছুতে হাত না দেয়, দরজা না খোলে।

- না, না কিছুতে হাত দেবো না।

ডিং ... ডং ...

- আপনিই শর্মিলা দেবী।

- হ্যাঁ আমিই, চলুন ঐ পাশের বাড়িতেই মাসিমা থাকেন।... দেখছেন দরজার বাইরে কয়েকদিনের কাগজ, দুধের প্যাকেট সব পড়ে আছে, উহু - কি পচাঁ গন্ধ।

- দেখছি, অ্যাই দরজাটা ভাঙো তো। আর শর্মিলা দেবী আপনিও আমার সঙ্গে একটু ভিতরে আসবেন। উইট্‌নেসের ব্যাপার তো।

- ও মাঁ ! এ কি গো ! এ যে দেখছি মাসিমা... মরে একদম কাঠ। ওয়াক্... ওয়াক্ এরই গন্ধ পাচ্ছিলাম তা হলে।

- ঠিক আছে বাইরে বেরিয়ে আসুন। এবার বলুন তো, ওনার কোন নিকট আত্মীয়-স্বজন কাউকে চেনেন ?

- সেরকম একটা নয়। আসলে আজকালকের দিনে কে-কার খোঁজ রাখে বলুন তো ? মেসোমশাই তো অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। দুই ছেলে পুণা আর কেরালায় থাকে। বড় বড় কোম্পানিতে কাজ করে।

***

রিং... রিং... রিং...

- হ্যালো সার্ন কোম্পানি থেকে বলছি।

- হ্যালো, আমি প্রবীর, প্রবীর ঘোষের মা বলছি, ওনাকে এক্ষুনি ডেকে দিন। খুব দরকার।

- আমি স্যারের সেক্রেটারি বলছি। উনি তো এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ আছেন। আপনি আমাকে বলুন। আমি স্যারকে ম্যাসেজটা দিয়ে দেব।

- ওর বাবা... ওর বাবা আর নেই। আপনি ওকে এক্ষুনি খবরটা দিন।

- নিশ্চয়ই ম্যাম। আমি এক্ষুনি ম্যাসেজ দিয়ে দিচ্ছি। উনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবেন।

রিং... রিং... রিং...

- আমি প্রবীরের মা বলছি। আজ ছ'দিন ধরে আপনাকে বার বার বলছি প্রবীরকে একটু দিন। বাড়িতে, মোবাইলে কোথাও ওকে পাচ্ছি না। ওর বাবার মৃতদেহ ওর জন্য মর্গে প্রিজার্ভ করে রেখেছি। আমি কোন কথা শুনতে চাই না, আপনি ওকে এক্ষুনি ডেকে দিন।

- আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো ? স্যার একথা জানেন না ? প্রথম দিনই ওনার বাবার মৃত্যু সংবাদ ওনাকে দেওয়া হয়েছে। স্যার এখন বিজি, প্রয়োজন হলে স্যার নিজেই আপনাকে ফোন করে নেবেন। বার বার বিরক্ত করবেন না।

- কি বললে ? ও জানে ? আমি বিরক্ত করছি ? তোমার স্যার কে একটা ম্যাসেজ দিয়ে দাও। আজ থেকে ডঃ সুবীর ঘোষ আর তার স্ত্রীর কোন সন্তান নেই। আমরা নিঃসন্তান।

***

কি ওপরের অংশগুলো ঠিক কি ? কোন রহস্য কাহিনী, নাকি কোন নাটকের অংশ, নাকি অন্য কিছু ?

না ওপরের কাহিনীগুলি এগুলোর কোনটাই নয়। ওগুলো এক একটি ঘটনা যা স্থান - কাল- পাত্র ভেদে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত চোখে পড়ে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে কোন রহস্য, কোন রোমাঞ্চ নেই, আছে এক যন্ত্রণাময় অমানবিকতার মর্মান্তিক পরিণতির কথা। বাবা-মা তার সমস্ত সহায়-সম্বল পণ করে সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করতে চায়, চাকরিতে উচ্চপদস্থ দেখতে চায়। এর মধ্যে অবশ্য নতুনত্ব কিছু নেই। নতুনত্ব যেটা - তা হ'ল ওপরের ঐ ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তিকরণ। এ থেকে অনেকের মনে হতে পারে – তা হলে পুরোনো সময়টাই বোধ হয় ভালো ছিল। আগে মানুষের আয় মূলতঃ পারিবারিক বিষয়-আসয় ভিত্তিক ছিল। তাই বৃদ্ধদের প্রতি এ হেন আচরণে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার ভয় ছিল। কারণ পৈত্রিক সম্পত্তি-ই ছিলো আয়ের মূল ভিত্তি। কিন্তু বর্তমানে এ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের জন্য মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-দেশান্তরে। আর এর সাথে সাথে তাকে সম্মুখীন হতে হচ্ছে এক প্রবল প্রতিযোগিতার। আবার কর্মহীন হয়ে পড়ার ভয়ও তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তাই আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে বিচার করে বাবা-মার সম্পর্ক তার কাছে আজ মূল্যহীন। তাই সেখানে কিসের মায়া, কিসের মমতা, কিসের দায় আর কিসেরই বা দায়িত্ব।

তবুও বৃদ্ধ বয়সে এসে অক্ষমতা আর একাকিত্ব যখন তাকে গ্রাস করে - তখন আত্মীয়-স্বজনদের ভালোবাসার ছোঁয়া পাবার এক তীব্র আকাঙ্খা তার সেই মরে কাঠ হয়ে যাওয়া চোখ দিয়ে সেই চিরাচরিত প্রশ্ন করায়, যার উত্তরটাতো খুব সহজ কিন্তু দেওয়া খুব কঠিন।

–"বলো আর কত পথ হাঁটলে মানুষ, মানুষ সে
মানুষ হবে ?"

–ঃ বিজ্ঞান মনস্ক আয়োজিত ঃ–

দু দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিকারী অনুষ্ঠান

স্থান

ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম

জোকা, কলকাতা - ১০৪

(ঠাকুরপুকুর ৩এ বাস স্ট্যান্ডের নিকট)

সময়

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০১২, দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা

৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১২, সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা

সংগঠন সংবাদ

বিগত তিন মাস সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গণসচেতনতা বৃদ্ধিকারী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। শীতকালীন মরসুমে বিভিন্ন অঞ্চলের বইমেলায় সমীক্ষণ বিক্রী করা হয়। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি, বীরভূমের পৌষ মেলা , আসানসোল বইমেলা, সোনারপুর বইমেলা, বেহালা বইমেলা এবং সর্বশেষে কলকাতা বইমেলায় সমীক্ষণ সংগ্রহ করতে পাঠকদের আগ্রহ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। সমীক্ষণের রচনাগুলি নিয়ে বিশেষতঃ 'পরিবেশ ভাবনা' এবং 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' (যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা) পাঠকদের মধ্যে নানা বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এছাড়া গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও দর্শকরা সমীক্ষণ সংগ্রহ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন।

গত ৪ঠা নভেম্বর সোনারপুর দেশবন্ধু পার্কে সোনারপুর বন্ধু মহলের পরিচালনায় জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বিচিত্রানুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক 'খাদ্যে ভেজালের কুফল ও সচেতনতার দিক, সংক্রান্ত প্রদর্শনমূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে। উক্ত অনুষ্ঠানে ভেজাল বলতে কী বোঝায়, ভেজালের কুফল কী এবং এর প্রতিকারের প্রসঙ্গে বক্তারা হাতে কলমে উপস্থিত দর্শকদের সামনে তাদের ব্যাখ্যা পেশ করেন।

গত ৬ই নভেম্বর সোনারপুর রেল কোয়ার্টার পার্কে সত্যজিত রায় ইনস্টিটিউট হলে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের পরিচালনায় একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল 'আন্তর্জাতিক রসায়ন বর্ষ ২০১১'। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে সমবেত সঙ্গীত, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং নাটক 'মাদাম ক্যুরি' মঞ্চস্থ হয়। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল রসায়নের জন্ম, বিকাশ, সামাজিক প্রয়োগ এবং অপপ্রয়োগ সংক্রান্ত। এছাড়াও একটি প্রদর্শনমূলক অনুষ্ঠান 'রসায়নের মজা' অনুষ্ঠিত হয়। নাটকে মাদাম ক্যুরি'র বাল্য জীবন, অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়।

গত ২৭শে নভেম্বর বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার কুমোড়পুর গ্রামে নবান্ন উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিকারী অনুষ্ঠান করে। ঐ অনুষ্ঠানে সমবেত সঙ্গীতও প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যক গ্রামীণ মানুষ সামিল হয়েছিলেন।

ঐ দিনই কলকাতার 'স্বদেশ প্রেম' নামক বিজ্ঞান সংগঠনের আহ্বানে একটি আলোচনা সভায় আমাদের কর্মীরা উপস্থিত হন। ঐ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার ক্রমাগত বৃদ্ধির বিপদ সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং 'যুদ্ধ বন্ধ করা' এবং রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার দাবী তোলেন। ঐ অনুষ্ঠানে আমাদের কর্মীরা এ প্রসঙ্গে আমাদের মতামত সমৃদ্ধ সমীক্ষণ (চতুর্থ সংখ্যা) পেশ করলে সভায় বিতর্ক ওঠে।

গত ১লা জানুয়ারি নদীয়া জেলার চাকদহ অঞ্চলের পানুগোপাল হাইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ অংশগ্রহণ করে। ঐ অনুষ্ঠানে অলৌকিকতার বিরুদ্ধে খাদ্যে ভেজাল কী ও কেন তা হাতে কলমে পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভূমিকম্পের কারণ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে একটি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান মনস্ক'র উদ্যোগে। এই অনুষ্ঠানে স্কুলের শিক্ষক ছাত্র অভিভাবক এবং এলাকাবাসীরা আমাদের বক্তব্য উৎসাহের সঙ্গে শুনেছেন। অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে পেশ করা সমবেত সঙ্গীত দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে।

গত ১২ই জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার পৈলানে একটি স্থানীয় ক্লাবের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ পালনকারী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'কে আহ্বান জানায়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সাপ নিয়ে আতঙ্ক ও তা থেকে মুক্তি প্রসঙ্গে এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ও ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শিত হয়। ওই জেলায় সম্প্রতি বিষ মদ কান্ড নিয়ে সংগঠন তার মতামত পেশ করে এবং এই সামাজিক ব্যাধি দূর করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা হয়। এই অনুষ্ঠানেও সমবেত সঙ্গীত উপস্থিত মানুষকে উৎসাহিত করে। ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com